ব • ন • ফু • ল

শ্রেষ্ঠ গল্প

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

বনফুল
শ্রেষ্ঠ গল্প

সম্পাদনা
আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৬৫

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০

তৃতীয় সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৯ নভেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড প্রিন্টিং
৫৫/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত আশি টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0164-10

ভূমিকা

১৯৯৯ সাল বাংলা ভাষার দুই পরাক্রমশালী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশের জন্মশতবার্ষিকীর বছর। দুই বাংলাতেই এই দুই কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-জ্ঞাপক আলোচনা-সমালোচনা লেখা হচ্ছে, আয়োজিত হচ্ছে অনুষ্ঠানাদি, পত্রিকাগুলোর কোনো কোনোটি আবার বিশেষ সংখ্যাও বের করছে। কিন্তু এর আড়ালে অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে এ বছরই বাংলা ভাষার অনেক সার্থক ছোটগল্পের অন্যতম পুরোগামী স্রষ্টা বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়েরও জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত হচ্ছে। সম্ভবত সে-কারণেই এ-ধরনের কোনো আয়োজনের খবর তেমন একটা শোনা যায় না। তবে বাংলা সাহিত্যের মোটামুটি খোঁজ রাখেন এমন কে না জানেন যে বনফুল বাংলা ভাষার আধুনিকতম শিল্পমাধ্যম ছোটগল্পের বৈষয়িক ও প্রাকরণিক দিক থেকে এক বিশেষ জগতের স্রষ্টা এবং ছোটগল্পের হ্রস্বতম রূপরচনার অদ্বিতীয় শিল্পী হিশেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য!

১

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারপুর গ্রামে। পিতা সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। পূর্ণিয়ার *সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়* থেকে ১৯১৮ সালে তিনি *ম্যাট্রিক* এবং *হাজারিবাগ সেন্ট কলাম্বাস কলেজ* থেকে ১৯২০ সালে *আই এস সি* পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে ১৯২৬ সালে *এম বি* পরীক্ষা দেয়ার কথা থাকলেও মারাত্মকভাবে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পরের বছর ১৯২৭ সালে পাটনায় প্রিন্স অব ওয়েলস মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে সেখান থেকে প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিশেবে *এম বি* পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ হাসপাতালে চাকরি হলেও স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে চাকরির পথে গেলেন না তিনি। কলকাতায় এসে খ্যাতিমান অধ্যাপক ডা. চারুব্রত রায়ের অধীনে প্যাথলজিস্ট হিশেবে একবছর শিক্ষানবিসী করে বিহারে চলে গেলেন। প্রথমে বছরখানেক হাসপাতালে কাজ করেন। এরমধ্যে সবকিছু গুছিয়ে নেন। এরপর ভাগলপুরে নিজস্ব ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থাকাকালেই তিনি বনফুল নামে কবিতা ও গল্প লিখে অল্পবিস্তর পরিচিতি *অর্জন* করেন। *এম বি* পাশ করার পর কিছুকাল প্র্যাকটিসে এবং সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় লেখালেখিতে ছেদ পড়ে। ১৯৩৩ সালে আবার আত্মপ্রকাশ করেন *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায়। কবিতা এবং গল্প দুইই প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস *তৃণখণ্ড* এবং কাব্যগ্রন্থ *বনফুলের কবিতা*। সাহিত্য রচনার শুরু থেকেই অনুভূত হয় যে বাংলাসাহিত্যে কৌতুক এবং ব্যঙ্গের ধারাকেই পরিপুষ্ট করবেন তিনি।

লেখক হিশেবে বনফুল বৈচিত্র্যপিয়াসী এবং অজস্রপ্রসূ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি সকল মাধ্যমেই তিনি সৃষ্টিশীল ছিলেন। তবে গুরুত্ববিচারে ছোটগল্পেই সার্থকতা সর্বাধিক। বৃহদায়তন উপন্যাস রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে *স্থাবর* (১৩৫০) ও *জঙ্গম* (১৩৫৮) বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সফল উপন্যাস। জীবনী-নাটকের লেখক হিশেবেও তিনি বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট। *শ্রীমধুসূদন* (১৯৩৯) এবং *বিদ্যাসাগর* (১৯৪২) তাঁর রচিত এ-ধরনের নাটক। তাঁর উপন্যাস *ভুবন সোম* অবলম্বনে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন *ভুবন সোম* নামে এক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখবার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু ঘটে।

২

রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্প পরিণত রূপ লাভের পর এর বাঁক বদল ঘটেছে যে ক-জন কথাশিল্পীর হাতে বনফুল তাঁদের অন্যতম। ছোটগল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে নিজস্ব এক জীবনদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। আশ্চর্য বাকসংক্ষিপ্তি, 'ভাবানুষঙ্গে অনির্বচনীয় রহস্যকরতা', পরিহাস-রসিকতা বনফুলের ছোটগল্পের মৌল লক্ষণ। বাকসংক্ষিপ্তি এবং নৈর্ব্যক্তিক জীবনদৃষ্টির কারণে বনফুলের রচনাকে আকস্মিকভাবে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে পারে। সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্য সমালোচনায় বনফুলের সাহিত্য কিছুটা উপেক্ষা হয়তো এই কারণেই পেয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাজ্ঞ সমালোচকও একই ধরনের ভ্রান্তির শিকার হয়ে লিখেছিলেন,

> তিনি ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও ঘটনাবিন্যাসের যথার্থতা লইয়া বিশেষ মাথা ঘামান নাই। স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে ইহার অন্তর্নিহিত পরিহাসটুকু ব্যক্ত করিয়া, অতর্কিতের ধাক্কায় পাঠককে খানিকটা চকিত করিয়া, গল্প শেষ করিয়াছেন। কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন গল্প-সংগ্রহে যেমন গল্পের নীতিকথাটুকুই লেখকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আধুনিক যুগের বনফুলের গল্পে তদনুরূপ ব্যঙ্গাত্মক অসঙ্গতিটুকু ফুটাইয়া তোলাই যেন গল্প রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে।

বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে রায় দিয়েছেন তার কারণ বৃহদায়তন *জঙ্গম*, *স্থাবর* বা *ডানার* মতো উপন্যাস রচনায় বনফুলের সাফল্য। অথচ—

> উপন্যাস তাঁর নিত্যনবায়মান শক্তিমত্তার সাক্ষ্যমঞ্চ, কিন্তু ছোটগল্পেই রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। উপন্যাসে কত বিচিত্র মানুষ, কত বিচিত্র কাহিনী—কত বিচিত্র ধরনে তাদের কথা বলার সজ্ঞান সচেতন প্রয়াস! জীবনকে শিল্পে ধরে রাখার কত নতুন নতুন প্রয়োগ নৈপুণ্য! সাহিত্য শিল্পীর সেখানে কৃতিত্ব অপরিসীম। কিন্তু সৃষ্টিপ্রেরণা ও সৃষ্টিকর্ম যেখানে অপৃথগ্‌যত্নসম্ভূত, সেখানেই বাণীপ্রকাশ চরমোৎকর্ষ লাভ করে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টাও সেখানেই স্বয়ংপ্রকাশ। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই 'বনফুল'-এর এই আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে সার্থক ও সহজ হয়ে উঠেছে। এখানেই তাঁর জীবনদর্শন সম্যক স্ফূর্তি পেয়েছে। তাঁর শিল্পরীতি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতীক হতে পেরেছে।'
>
> —জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত ***বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*** বইয়ের ভূমিকা

ছোটগল্পে গীতিকবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গীতিকবিতার মতোই ছোটগল্পে মুহূর্তের মধ্যে 'শাশ্বত জীবন-রহস্যের দ্যোতনা অভিব্যঞ্জিত হয়'। পার্থক্য শুধু এই যে গীতিকবিতায়

কেবল কবির মনের বিশেষ আত্মনিবিষ্ট ভাবময় মুহূর্ত বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, ছোটগল্পে ব্যক্তির বিভিন্ন ভাবনার বিচিত্র মুহূর্ত প্রতিভাত হয়; অর্থাৎ গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্য দাঁড়াল এখানে যে, ছোটগল্পে জীবনের সত্য ধরা দেয় বহুবিচিত্ররূপে আর গীতিকবিতায় সুন্দর, কুৎসিৎ, উদার, নীচ, আত্মসুখপরায়ণতায় অতি সংকীর্ণ কিংবা 'পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত বিশেষ' রূপে।

বনফুল জীবনসত্যের বিচিত্ররূপকে তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর চোখে মানুষ স্বর্গের দেবতা নয়, আবার নরকের শয়তানও নয়। মানুষকে তিনি দেখেছেন মানুষেরই রূপে। মানুষ ভুল করে, অন্যায় করে, পাপাচরণ করে, সেজন্যে সে শাস্তি পায়, প্রায়শ্চিত্ত করে অনেক মূল্য দিয়ে। এই-সব-কিছু মিলিয়েই মানবজীবন, আবার এইসবই মানবনিয়তি। মানবজীবনের এই বিমিশ্র রূপকে বনফুল মূল্যায়ন করেছেন যথার্থভাবে। জীবনকে মূল্যায়ন করার এই বনফুলীয় ধরনকে রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছেন বনফুলকে লেখা এক চিঠিতে :

> যেন তুমি উদ্ভিদবিজ্ঞানী, হাটে যাবার মেঠো রাস্তায় যেতে যেতে এদিক-ওদিকে আগাছা এবং ঘেসো গাছ-গাছড়া যা তোমার চোখে পড়েছে, তোমার নমুনার বইয়ে সেগুলোকে গেঁথে রেখেছ। এগুলো পথিকদের চোখ এড়ায়—কেননা এরা না দেয় পূজার ফুল, না চড়ে চীনে ফুলদানিতে। এরা আদরণীয় নয়, পর্যবেক্ষণীয়। তুলে ধরে দেখিয়ে দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া গেল, কিছু কৌতুক লাগে মনে। মেঠো পথটা চৌরঙ্গী রোড নয়, কিন্তু জীবলোকের নানা আমেজ ওর এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকে, ওর ফড়িং টিকটিকিগুলো ময়ূর-হরিণের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু ঝুঁকে পড়ে যদি দেখা যায় তাহলে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে—আর ঘেসো জগতের সঙ্গে ওদের মিল দেখে কিছু মজাও লাগে।

পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করেছিলেন এইভাবে :

> ... বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা-পরগাছা ওষধি-বনস্পতি সব কিছুতেই যে-দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাই তো, এ তো আমি দেখি নি, কিংবা এই আমি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখ ভোলানো সামগ্রী নিয়ে, এখনকার সাহিত্য চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে। তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজ-পরানো কনে দেখানোর মতো করে প্রকৃতিকে দেখতে গেলে এ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়, ঠিকটি দেখা গেল বলে হাততালি দিয়ে ওঠার উৎসাহ চলে যায়। জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান করে দেখাবার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক। তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে। তোমাদের ভয় পাছে ছোটকে বাড়িয়ে বল, পাছে তার অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে ফেল।

রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তাকে সংক্ষেপ করে বললে বলা যায় যে বনফুল জীবনকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যতটুকু জেনেছেন, ততটুকুকেই যথার্থ মহিমায় প্রকাশ করেছেন। কোথাও কম করে দেখাবার বা কোথাও বেশি করে দেখাবার চেষ্টা তাঁর ছিল না। বনফুলের জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে গোপীকানাথ রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন :

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কোনো বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলি যেমন সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, বনফুল তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আলোয় মানব মনের গোপন অনতিস্পষ্ট অংশগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন। আর তারই মধ্য দিয়ে জীবনের সম্যক পরিচয়লাভেও উদ্যোগী হয়েছেন। জীবনকে কোনো প্রথাবদ্ধ সংস্কার কিংবা ভাবাবিষ্ট আবেগের মধ্য দিয়ে দেখেন নি বনফুল। মানুষকে এক সংস্কারমুক্ত, মোহাবেশ-বর্জিত স্বচ্ছ রৌদ্রদীপ্ত 'অবজেকটিভ' বিজ্ঞান-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন তিনি। নানা 'অসাধারণ' অবস্থা বা পরিস্থিতিতে মানুষকে ফেলে তার গূঢ় মানস প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ বনফুলের বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের ধর্ম। তাঁর দৃষ্টিতে এ-কালে মানুষের চরিত্রের স্বতন্ত্র স্বয়ংনির্ভর কোনো মহিমা নেই, মানবসত্তা আজ একান্তভাবে পরিবেশের দাস। মানুষের যে পরিচয় তার চেতনসত্তায় প্রকাশ পায় না 'বিশেষ' পরিস্থিতিতে তাঁর অবচেতন সত্তার আকস্মিক উদ্ভাসনের ফলে সেইসব প্রচ্ছন্ন 'বিকৃত' বিকলাঙ্গ দিকগুলি সহসা উদঘাটিত হয়ে আমাদের মনে মানুষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটায়।

—*পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি: বনফুল* ॥ গোপীকানাথ রায়চৌধুরী

এই প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপারে জগদীশ ভট্টাচার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির লেখকদের বলা হয় Naturalist বা প্রকৃতিবাদী লেখক। ফরাসি সাহিত্যের এমিল জোলা বা বালজাক এই ধারার প্রতিনিধি। বনফুল ঠিক আবার সম্পূর্ণত তাঁদের ঘরাণার নন। তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকারও। সে-কারণেই জগদীশ ভট্টাচার্যের ভাষায় 'শিল্পরীতি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতীক'।

বনফুলের গল্প (১৯৩৬), *বনফুলের আরো গল্প* (১৯৩৮), *বাহুল্য* (১৯৪৩), *বিন্দুবিসর্গ* (১৯৪৪), *অদৃশ্যলোক* (১৯৪৭), *তন্বী* (১৯৫২) *অনুগামিনী* (১৯৫৪), *নবমঞ্জরী* (১৯৫৪), *ঊর্মিমালা* (১৯৫৫), *অনুগামিনী* (১৯৫৮), *করবী* (১৯৫৮), *সপ্তমী* (১৯৬০), *সপ্তমী* (১৩৬৭), *দূরবীন* (১৯৬১), *রঙ্গনা* (১৯৫৬), *মণিহারী* (১৯৬৩), *ছিটমহল* (১৯৬৫), *একঝাঁক খঞ্জন* (১৯৬৭), *অদ্বিতীয়া* (১৯৭৫), *বহুবর্ণ* (১৯৭৬), *বনফুলের নূতন গল্প* (১৯৭৬) বনফুলের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। তাঁর ছোটগল্পের জগত পরিক্রমায় গেলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি মানবজীবনের বিপুল বৈচিত্র্যকে এঁকেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্রেরা যেন ঠিক 'অপরিচিত নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব।'

—***বনফুলের ফুলবন*** ॥ সুকুমার সেন

তিনি কেবল মধ্যবিত্তের সমস্ত আচরণ ও জীবনযাত্রার আড়ালের অসঙ্গতিটুকু ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি বিশেষ আঙ্গিকের সাহায্য নিয়েছিলেন। তাঁর বিজ্ঞানীর মেজাজ তাঁকে আবেগ উচ্ছ্বাসের তরল পথ বর্জন করতে শিখিয়েছে, আসক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেয় নি। এমনকি মানবচরিত্রের নানা ত্রুটির জন্য তিনি বিশেষভাবে কাউকে দায়ী করতে চান নি, তাঁর অভিযোগের আঙুল কখনো সমাজের দিকে, কখনো বা নিজের দিকে আবার কখনো বা নির্মম ভাগ্যবিধাতার দিকে। তাঁর গল্পের ভাষা এবং বিশেষ টেকনিকেও কৃত্রিমতার ছাপ লাগে না। মনে হয় এটাই স্বাভাবিক ছিল।

—বনফুল : *সত্য বিবেকের উপাসক* ॥ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

মানবজীবন অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিমতার মুখোশে ঢাকা। মুখোশের আড়ালটুকু সরিয়ে নিলেই জীবনের করুণ চেহারা বেরিয়ে পড়ে। বনফুল যেন কেবল জীবনের কৃত্রিমতার মুখোশটুকুই সরিয়ে ফেলতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যে, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আঘাত করার ইচ্ছে

যেন তাঁর নেই। জীবনের অধঃপতিত রূপের জন্য দায়ী মানুষকে শাস্তিও দিতে চান না, অধঃপতিতের সংশোধনের জন্য 'পাদ্রীসুলভ দায়িত্বও তিনি নেন নি।' মানুষকে কেবল অধঃপতন সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন; শুধু তাই নয়, সচেতন করে দিতে চেয়েছেন জীবনের শক্তির রূপ সম্পর্কেও।

৩

বনফুল *কল্লোল*-এর সমসাময়িক ছিলেন। তবে *কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি* পত্রিকা কেন্দ্রিক লেখকগোষ্ঠী যে জীবনচেতনার রূপকার ছিলেন, বনফুল সেই ধারার লেখক নন। *কল্লোল*-এর লেখকেরা ছিলেন রবীন্দ্র-চেতনা বিদ্রোহী, তাঁদের লেখার সাধারণ লক্ষণ ছিল, লিবিডো-চেতনা, 'অন্ধকারে আলো-হাতড়ানো, ক্বচিৎ আলোর সন্ধান লাভ'। মোটকথা একটি বিদ্রোহী চেতনা ছিল তাঁদের জীবনবোধের অনুষঙ্গী। বনফুলের জীবন-চেতনা অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ হলেও তিনি ঠিক বিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রবলভাবে *কল্লোল*-বিরোধী *শনিবারের চিঠি* গোষ্ঠীর লেখক। একভাবে দেখলে আমরা অনুভব করব যে, *শনিবারের চিঠির* লেখকেরাও *কল্লোল*-এর লেখকদের মতোই যুগযন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তাঁরাও ঠিক পূর্বসূরীদের অনুবর্তনে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে *কল্লোল*-এর লেখকদের মৌল পার্থক্য এইখানে যে *কল্লোল গোষ্ঠীর* লেখকেরা 'বিদ্রোহী' আর *শনিবারের চিঠি* দলভুক্ত লেখকেরা 'পরিহাস-প্রবণ'। ফলে তাঁরা কেবল কল্লোলীয়দের বিদ্রোহের বিকারটুকুর বিরুদ্ধতা করেছেন পরিহাস-বিদ্রূপের পথে। এখানেই তাঁদের সীমাবদ্ধতা। ভূদেব চৌধুরী যথার্থই বলেছেন যে :

> তা না-হলে এঁদেরও শিল্পীচেতনার মূলে যুগযন্ত্রণাবোধের অসহায়তা, আর প্রতিকারহীন ব্যর্থতার অনিবার্য বিষাদ প্রায়ই অন্তর্লীন হয়েছিল।

বনফুল *শনিবারের চিঠি* গোষ্ঠীর লেখক হলেও ছিলেন কিছুটা মধ্যপন্থী। যুগযন্ত্রণাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেও রাজি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে যুগযন্ত্রণার আড়ালেও 'চিরন্তন মানব হৃদয়টি অম্লান রয়ে গেছে'। ব্যঙ্গ বা পরিহাসের পথ দিয়ে এই সত্যটিকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন মাত্র। ফলে শুধু পরিহাসরসিক বললে তাঁর অভিধাটি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষের ভুলটুকু দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রতিকারের চেষ্টা করেন নি। তাঁর বিশ্বাস মানুষের ভালোমন্দ তারা নিজেরাই বুঝে নেবে। তাঁর পরিহাসরসিক সত্তা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ ও মানবজীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর এই ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণধার হলেও তিনি হৃদয়হীন নন। মানুষকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষের দুর্বলতা, হীনতা, নীচতা বা কৃত্রিমতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্তরালে মানুষের অসহায়তার প্রতি প্রকাশিত তাঁর কারুণ্য মিশ্রিত সহৃদয় মমতার বোধ এক অপরূপ বিচিত্রস্বাদ রসব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।

ব্যঙ্গরসের শিল্পী হিশেবে বনফুলের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে আর এক ব্যঙ্গরসসিদ্ধ লেখক প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন :

> প্রবণতাভেদে সাহিত্যিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; একদলের যুগের সহিত বেশ বনিবনাও হয়, অপর দলের তেমনটি হয় না। প্রথমোক্ত দলের রুচি, প্রবণতা, দৃষ্টি সমস্তই যুগানুকূল, অন্য দলের যুগপ্রতিকূল। ফলে একদল যুগের সঙ্গে বনিবনাও করিয়া

> লয়, অন্যদল কেবলি প্রতিবাদ করিয়া মরে। এই শেষোক্তি দলের মনোবৃত্তি হইতেই ব্যঙ্গ-রচনার জন্ম। ...
>
> পৃথিবীতে যত উচ্চ শ্রেণীর ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক জন্মিয়াছেন সকলেই অল্পবিস্তর যুগপ্রতিকূল, যুগানুকূল লেখক কদাচিৎ ব্যঙ্গ রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।
>
> ব্যঙ্গ রচনার মূলে আছে সংসারকে সংশোধন করিবার আকাঙ্ক্ষা যুগের সহিত, সংসারের সহিত যাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে তাহার তো এ আকাঙ্ক্ষা হইবার কথা নয়। ব্যঙ্গ রচনা Moral শক্তি সম্ভূত, ব্যঙ্গ সাহিত্যিক Moralist, creative লেখকের সহিত এখানে তার মূলগত প্রভেদ। নিছক সৃষ্টির আনন্দ চালিত করে creative লেখককে তার কর্তব্যবুদ্ধি চালিত করে ব্যঙ্গ লেখককে। হয়তো কর্তব্যের মধ্যেও আনন্দ আছে, কিন্তু সেখানে আনন্দটা গৌণ। তাহার দীপ্তি তেমন সতেজ নয়। প্রবণতার বিচারে Satiarist-এর স্থান সাহিত্যিক সমাজে তেমন নয় যেমন সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে। বস্তুত অধিকাংশ প্রধান Satiarist বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্যিকের জীবনে সমাজ সংস্কারকও বটে। ...
>
> ... কখনো কখনো দেখা যায় যে কোনো কোনো লেখকের মনের একটা অংশ যুগানুকূল; সেখানে যে creative লেখক আর অপর অংশটা যুগপ্রতিকূল ; সেখানে সে Satiarist। ও দুটো কোঠা অনেক সময় একই মনে আলাদা দেখা যায়। বিচিত্র এই মানুষের মন। বনফুল এই শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক। যুগপৎ তিনি যুগানুকূল ও যুগপ্রতিকূল, একাধারে তিনি creative লেখক ও Satiarist।

ব্যঙ্গের পাশাপাশি কৌতুকরসের উৎসারণও ছোটগল্পের সত্তার স্বভাবজাত ব্যাপার। তবে যদি শুধুমাত্র কৌতুকরসেই তাঁর গল্প শেষ হয়ে যেত তাহলে .তিনি এতটা তাৎপর্যপূর্ণ লেখক হিশেবে চিহ্নিত হতেন না। তার *ক্যানভাসার* গল্পটির দিকেই তাকানো যেতে পারে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হীরালাল এক অজপাড়াগাঁয়ে গেছে দাঁতের মাজন বিক্রি করতে। তার নিজের দাঁত পরিষ্কার, ঝকঝকে মুক্তার মতো। গ্রামের অধিবাসী ভৈরবের সঙ্গে কথায় কথায় তর্ক বেঁধে গেলে ভৈরব তার গালে সজোরে চপেটাঘাত করে বসে। ভৈরবের আঘাতে হীরালালের নকল দাঁতের পাটি ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ে।

এখানে ঘটনার আকস্মিকতা এবং কৌতুকরসের অভিনবত্বেই যদি গল্পটি শেষ হয়ে যেত তাহলে এটিকে আমরা উচ্চমানের গল্প হয়তো বলতে পারতাম না। বনফুলের মমত্বমণ্ডিত জীবনবোধের দেখা পাই যখন গল্পে আকস্মিকভাবে এই কাণ্ডটি ঘটে যাওয়ার পর প্রহৃত ক্যানভাসারকে দিয়ে তিনি বলান,

> কেন মারধোর করছেন মশাই! গরিব মানুষ, এই করে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।

গল্পশেষের এই করুণ পরিস্থিতিটির মধ্য দিয়ে বনফুলের মমতামিশ্রিত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লঘু চালে তিনি এখানে পরিবেশন করেন 'গাঢ় গভীর রসের স্বাদ'।

জৈবিক নিয়ম গল্পটিতে জৈবিক নিয়মের অসঙ্গতি নিয়ে বনফুল পরিহাস করলেও গল্পের শেষের মর্মান্তিক পরিণাম গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ ও গভীর করে তুলেছে। গল্পটি এ-রকম : আঠারো-কুড়ি বছরের একটি ছোকড়া প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত এক তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে কুলি, সোডাওয়ালা ও চানাচুরওয়ালার কাছে পৌরুষ প্রকাশ করল। সর্বাত্মকভাবে সে চেষ্টা করল তার বাহাদুরিকে তরুণীটির কাছে ফুটিয়ে তুলতে। এভাবে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল ছেলেটির। মেয়েটি যাবে পরের ট্রেনে।

ছেলেটির ট্রেন এসে গেছে। এক সময় আস্তে আস্তে ট্রেনটি চলে যেতে থাকল। তখনো ট্রেনে উঠল না ছেলেটি। ট্রেনের গতি যখন বেশ বেড়েছে তখন সে তার শেষ বাহাদুরিটা দেখাবার জন্য সহাস্যমুখে নমস্কার করে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু তখনি পা ফসকিয়ে একবারে নিচে, চাকার নিচে পড়ে গেল সে।

জৈবিক নিয়মের হাস্যকর অসঙ্গতি নিয়ে বনফুল পরিহাস করলেও গল্পটির গভীরে লুকিয়ে আছে যৌবনের প্রতি তাঁর সমবেদনার অশ্রু। অসঙ্গতিপূর্ণ যৌবন পরিহাসের বিষয় হলেও যৌবনের বলিষ্ঠ প্রাণ-ধর্মকে তিনি আন্তরিকভাবে ভালোও বেসেছেন। সেই ভালোবাসাটুকুই ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

> মানুষের জীবনে বিচ্যুতি, অসঙ্গতি, অন্যায়, অনেক কিছুই আছে; কিন্তু তারা কখনোই মানুষের জীবনের আকাশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলে না, বিষণ্ন হতাশায় বনফুল কখনো ভেঙে পড়েন না। মানবজীবনের আধি ব্যাধি যন্ত্রণা দেখেও এই জীবনকে অবরুদ্ধ পঙ্কিল জলাশয় ভেবে 'মর্বিড' (Morbid) বা রুগ্ন মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেন না।
>
> —*পরীক্ষাপ্রবণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি: বনফুল* ॥ গোপীকানাথ রায়চৌধুরী

মানুষ নামের ছোটগল্পটি যেন তাঁর জীবনদর্শনের মূর্ত প্রতীক। গল্পটি বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষে। গঙ্গাবক্ষে অস্তায়মান সূর্যের বর্ণসমারোহে মায়াবী যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে তাকালে ভাবাবিষ্ট চোখে পৃথিবীকে অপরূপ স্বপ্নীল মনে হয়। তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়, রোমন্থনরত নধরদেহ গাভী, মুদিতনয়ন মার্জার, নহবতে পূরবীর সুর—সব মিলিয়ে সুন্দর এই পৃথিবী! কিন্তু এই সৌন্দর্যের ঘোর কেটে যায় বাস্তবের আঘাতে। দেবালয়ের স্বর্গীয় পরিবেশের পাশেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারি ও তার মেয়ে। দু'জনেই ভিক্ষা প্রার্থনা করছে। মেয়েটির শরীর সুস্থ। ছিন্ন বসনের শতছিদ্রপথে যৌবন উপচে পড়ছে। মেয়েটি তার যৌবন সম্পর্কে সচেতন। ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে একই উদ্দেশ্যে—ক্ষুধার অন্নের জন্য ভিক্ষা তাদের ব্যবসা। একজনের মূলধন ব্যাধি, অন্যজনের যৌবন। যে মুদিত নয়ন মার্জারটি দেখা যাচ্ছিল সেটি তপস্যারত ছিল না, ছিল ওঁৎ পেতে। ইঁদুর ধরার ছল ছিল সেটা। নধরদেহ গাভীর দুধ দোহন করা হচ্ছে মাতৃস্তনাভিমুখী গোবৎসটিকে বঞ্চিত করে। ইঁদুরের চিৎকার আর গোবৎসের আকুতি সন্ধ্যার স্বপ্নময় আবহকে বিঘ্নিত করল। এ-তো গেল প্রকৃতির একটি দিক। বাড়ি ফিরে খবর পাওয়া গেল যে পাশের বাড়ির বধূটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। সদ্য পুত্রশোকাতুরা লেখকের গৃহিণী সজলচোখে প্রার্থনা করছেন নবজাতকের দীর্ঘজীবন। খবরের কাগজের পাতায় দেখা যাচ্ছে বহু বাধা সত্ত্বেও একটি সতী মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করছে। বহুবার ব্যর্থ হয়েও এভারেস্ট অভিযান থেমে থাকছে না। এগুলো যেমন জীবনের এক দিক তেমনি স্বার্থপরতার দিকও প্রবল। শ্রেয়তর প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও সুপারিশের জোরে ভাইয়ের চাকরি হওয়ার অবিচারেও বিচলিত হয় না গল্পের নায়ক। এরপর ছাদে উঠে দেখা গেল উদীয়মান চন্দ্রের আভায় পৃথিবী মায়াবী হয়ে আছে। কিন্তু এই আবহ উপভোগের জন্যও প্রয়োজন পার্থিব সিগারেটের নেশা। তাই নায়ককে নেমে যেতে হয় গলির মোড়ে। অর্থাৎ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের চেয়েও মানুষের কাছে বড় হয়ে দেখা যায় সামান্য জৈবতৃপ্তি। এই গল্পে বনফুল বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই বৈপরীত্যের নামই মানব জীবন, 'স্বর্গ ও নরককে একই সঙ্গে বুকে ধরে এই যে নিত্য প্রকাশমানা প্রকৃতি—এরই নাম মানুষের পৃথিবী', মানবজীবন। বনফুলের ছোটগল্প জগতে প্রতিফলিত জীবনদর্শনও এটাই।

মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের নানা ফাঁকি এবং অসঙ্গতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া বনফুলের কোনো কোনো গল্পের উদ্দেশ্য। *বিবেক, শরশয্যা, বুঁচি, নিমগাছ, অহংকার পাঁড়ে, দামোদর, পাশাপাশি* প্রভৃতি এই ধারার গল্প।

বিবেক গল্পটির কথাই ধরা যাক। গল্পের নায়ক এক ছা-পোষা মধ্যবিত্ত। সে গরিব রামবাবুর প্রতি ধনী শ্যামবাবুর অত্যাচারের প্রতিবাদে এগিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে কেবল বন্ধু-বান্ধবই নয়, স্বয়ং রামবাবুও নায়কের পক্ষ ছেড়ে শ্যামবাবুর দলে গিয়ে ভিড়েছেন। বিবেকের দাবি মেটাতে গিয়ে সে বিপদে পড়ে যায়। শেষ পর্যায়ে বন্ধু প্রাণকান্তর পরামর্শ শুনে আত্মরক্ষার তাগিদে গল্পের নায়ক শ্যামবাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে। ফলে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায় নায়ক। কিন্তু তার বিবেক তাকে নিষ্কৃতি দেয় না। সেই রাতে সে স্বপ্ন দেখে :

> একটা ভীষণদর্শন বলিষ্ঠ লোক কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড একটা কলশি। প্রশ্ন করিলাম, কী খুঁজিতেছেন? আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি। দড়ি? আপনি কে? তোমার বিবেক, রাস্কেল!

নায়ক হরিহরের জীবনের অসঙ্গতিময় করুণ পরিস্থিতি মূর্ত হয়ে উঠেছে *হাসির গল্প* শিরোনামের গল্পটিতে। হরিহরের ব্যাধিজর্জর শরীর, তারই পাশে একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত, একটি শিশু ক্রন্দনরত, গৃহিণী অধৈর্য হয়ে মেজাজ গরম করছে, এরই মধ্যে আবার পাওনাদার মুদি দোকানি বাড়ি এসে কটূক্তি করছে। এ-রকম বেদনাদায়ক এক পরিস্থিতিতে একটা হাতলভাঙা চেয়ারে বসে গরম পানিতে পা দুটি ডুবিয়ে 'ফুটবাথ' নিতে নিতে হরিহর কাগজ কলম নিয়ে বসেছেন গল্প লিখতে। প্রচণ্ড মাথাব্যাথা। বাঁ হাতে মাথার রগদুটি চেপে চোখ বন্ধ করে গল্পের কথা ভাবছেন। সম্পাদকের তাড়া আছে, আজই লিখে দিতে হবে; নিজের মনের তাগাদাও কম নয়। একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবছেন তিনি। কারণ হাসির গল্পের লেখক হিশেবেই তাঁর খ্যাতি।

মধ্যবিত্ত জীবনের অসঙ্গতি ও গ্লানিময় আত্মসমর্পণের চিত্রও বনফুল অনেক গল্পেই তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে *শরশয্যা* গল্পের দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। গল্পের নায়ক দেশব্যাপী নারী নির্যাতনের ঘটনা শুনে বিচলিত। নারীত্বের এই অবমাননা রোধকল্পে যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলায় সে প্রস্তুত। সুদূর বিহারে একটি চাকরির সন্ধানে সে গিয়েছে। শ্বশুর মহাশয় তার জন্য চিঠি লিখে দিয়েছেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্দেশে। সুদূর প্রবাসে তিনিই ভরসা। চাকরির সন্ধানে এসে নায়ক দেখল একজন পেশাদার নারীশিকারী নারীত্বের অবমাননায় উদ্যত। নায়ক তাকে চপেটাঘাত করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, শ্বশুরমশাই সে-লোকটির কাছেই তাকে পাঠিয়েছেন চাকরির জন্য। সুতরাং 'উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল—আপনার কাছেই এসেছি—বিমলবাবুর জামাই আমি।' রসভঙ্গ হওয়াতে ভদ্রলোক বিরক্ত হলেও সকালে দেখা করার নির্দেশ দেন। কার্যসিদ্ধ হল নায়কের। কিন্তু এখানেও বিবেকের প্রহার থেকে নিষ্কৃতি নেই। তাই তাঁর উক্তি, 'ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।'

আগেই বলেছি বনফুলের লেখক-চেতনা ঠিক পরিপূর্ণভাবে বিদ্রোহী নয়। ফলে অতীতের মোহ তাঁকে ছেড়ে যেতে পারে নি। অতীতের কিছু মূল্যবোধের বিলোপ তাঁকে বেদনার্ত করে। মূল্যবোধের এই পরিবর্তনের যৌক্তিকতা থাকলেও বেদনা তাঁকে ছাড়ে না।

এই ধরনের অনুভব ক্রান্তিকালের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ক্রান্তিকালের টানাপড়েনে তাঁর লেখক সত্তা দোদুল্যমান। *স্মৃতি, শতাব্দীর ব্যবধান, বিবর্তন* ইত্যাদি গল্প এই গোত্রের। ক্রান্তিকালীন মানসিকতা তো প্রাথমিকভাবে আধুনিকতারই লক্ষণ। এমন একটা সময়ে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সবে অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে তখন বেকারত্ব, অভাব বা দারিদ্র্য জীবনের ওপর দাঁত বসালেও হৃদয়ের দারিদ্র্য তখনও বাঙালি জীবনে প্রবল হয়ে ওঠে নি। তিরিশের দশকের প্রবল অর্থনৈতিক মন্দাও সামাজিক এই কাঠামোটিকে ঠিকমতো আঘাত করতে পারে নি। এমন কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী জমিদারই হোক কিংবা কেরানিই হোক, কারোরই হৃদয়ে দীনতার স্পর্শ লাগে নি। কিন্তু একটা সময় তিনি লক্ষ করলেন তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে হৃদয়ের এই প্রাচুর্য হারিয়ে যাচ্ছে। বড় বেদনার সঙ্গে তা তিনি অনুভব করেছেন। এই অনুভবের সহৃদয় উপস্থাপনা উপযুক্ত গল্প তিনটিতে রয়েছে। *স্মৃতি* গল্পটি নিয়ে আলোচনা করে বিষয়টি পরিষ্কার করে তোলা যাক। গল্পের চরিত্র স্টেশন মাস্টার নিজে কষ্ট করে হলেও চিরকাল অতিথি আপ্যায়ন করে এসেছেন। স্ত্রীও ছিলেন তাঁর সক্রিয় সহযোগী। তাঁদেরই পুত্র মন্মথ বাড়িতে অঢেল জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিতৃবন্ধুকে এক রাতের জন্যও আশ্রয় দিতে চায় নি। লেখক এখানে অভিমানী সুরে বলছেন আশ্রয় তার কাছে প্রত্যাশাও করা হতো না। মাত্র একটি বাক্যে লেখকের এই অভিমানের গাঢ় অনুভব মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বলেছেন,

> করিতাম না যদি এই মন্মথ সেই মাস্টার মশাইয়ের ছেলে না হইত।

একই ধরনের অনুভব প্রকাশ পেয়েছে *শতাব্দীর ব্যবধান* গল্পে। ১৮৭২ সালের কোনো একদিন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার নিত্যানন্দ সেন এক মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচাবার জন্য গরুর গাড়িতে করে গভীর রাত্রে এক ক্রোশ দূরে রামপুর গ্রামে গিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত রোগী বাঁচে নি বলে তিনি কোনো ফি নেন নি। অথচ এর ঠিক একশ বছর পরে তাঁরই বিদেশি ডিগ্রিধারী নাতি রামপুর গ্রামের একই পরিবারের মৃতপ্রায় রোগীনীকে সাতদিনের আগে দেখার ডেট দিতে পারেন নি। *বিবর্তন* গল্পেরও একই সুর।

এতক্ষণ যে মূল্যবোধের অভাবে লেখক পীড়িত বোধ করেছেন তা বাঙালির ঐতিহ্য, সম্পদ। যুগধর্মের প্রহারে এই মানসিকতার অভাব ঘটে যাওয়াকে বনফুল মেনে নিতে পারেন নি। এ ধরনের সমৃদ্ধ মূল্যবোধের অবক্ষয় এক সময় জাতি-ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে—এই উপলব্ধি তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল। আর তা তাঁর চেতনায় গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই এই বেদনার অনুভব একাকীত্বেই সীমাবদ্ধ। কারণ এর কোনো প্রতিকার তাঁর জানা নেই। *উৎসবের ইতিহাস* গল্পে তাঁর এই উপলব্ধি বাঙ্ময় হয়েছে চমৎকারভাবে। গল্পটি এ-রকম :

সামান্য তিরিশ টাকা মাসিক বেতনে কেরানির চাকরি হয়েছে প্রথম শ্রেণীর এম এ পাশ নরেন মল্লিকের। এই চাকরির জন্য তার পিতা প্রবীণ মল্লিক ও পুত্র নরেন মল্লিককে বারংবার মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে হয়েছিল। উৎকোচ তো দিতে হয়েছেই, তার ওপর ঘুঘু মল্লিকের বয়স্থা কুরূপা মেয়েটির সঙ্গে ছেলের বিয়ের প্রতিশ্রুতিও পিতা প্রবীণ মল্লিককে দিতে হয়েছে। এতটা লাঞ্ছনার বিনিময়ে পাওয়া চাকরি উপলক্ষেও আয়োজন করতে হয়েছে উৎসবের। এই আয়োজন করার ক্ষমতাও তার ছিল না। তারপরও তা করতে হল মুখুয্যের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে। মধ্যবিত্ত সমাজের যে-কোনো

উৎসবের পেছনেই হয়তো রয়েছে এ রকমই করুণ ঘটনা। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে মধ্যবিত্ত জীবনের বাহ্যিক আড়ম্বরের আড়ালটুকু সরিয়ে ফেললেই দেখা যাবে এমনই লাঞ্ছনার ইতিহাস। মধ্যবিত্ত বাঙালি এমনিভাবে বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েও বাইরে সুন্দর হাসিটি বজায় রাখে। এই গল্পেও বনফুলের মৌল জীবনদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন মানবজীবনে 'গলাগলি করি আছে অশ্রু আর হাসি'।

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে জন্মানো মানুষের জীবনের অনেকগুলো নেতিবাচক দিকের চিত্র এতক্ষণ বনফুলের কয়েকটি গল্পের আলোকে তুলে ধরা হল। এত নেতিবাচকতার মধ্যেও এখনও অনেক বাঙালির হৃদয়ের ঔদার্য বা বিশালত্ব তিনি দেখতে পান এবং গৌরব বোধ করেন। *শ্রীপতি সামন্ত* গল্পটি এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিনি বলতে চান শ্রীপতি সামন্ত-এর মতো চরিত্রেরা প্রমাণ করে যে বাঙালি চরিত্রের যে-সব মৌল প্রবণতা এককালের গর্ব ছিল তা মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রামের স্বেদে ও প্রতিকূলতার আঘাতে শুকিয়ে এলেও কিংবা আধুনিক জীবনের স্বার্থপরতা ও লোভের গ্রাসে বিলীন হয়ে গেলেও একেবারে মরে যায় নি। *শ্রীপতি সামন্ত* গল্পটি এই রকম : ট্রেনে সেদিন প্রচণ্ড ভিড় থাকায় নিয়মিত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী শ্রীপতি সামন্তকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় অনেক বেশি ভাড়ায় উঠতে হল। সেদিন তার ঘুমের খুব দরকার ছিল বলে তিনি বাধ্য হয়েই উঠেছিলেন ঐ কামরায়। পোশাক-আশাকের কারণে শ্রীপতি সামন্তকে দেখে আর্থিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বলেই মনে হবে। এমন পোশাকের এই মানুষটিকে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওঠা ভদ্রলোকটি প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরায়ও উঠবার অনুমতি দেন নি। কিন্তু টিকিট চেকার আসবার পরে দেখা গেল যে-ভদ্রলোকটি শ্রীপতি সামন্তকে ট্রেনে উঠতে দিতে চান নি তাঁর কোনো টিকিটই কাটা নেই। ভদ্রলোকটিকে এ অবস্থায় পেয়ে টিকিট চেকার যখন বাঙালির জাত তুলে গালাগালি দিতে লাগল তখন শ্রীপতি সামন্ত তাঁর সুদীর্ঘ গেঁজে বের করে ভদ্রলোকটির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। এর কারণ দুটি। একটি কারণ পরের দিন অনেক টাকার কেনাবেচার স্বার্থে রাতে ভালো ঘুম হওয়া তার জরুরি। আর দ্বিতীয় কারণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির জাত তুলে গালাগাল দিলে বাঙালি হিশেবে তা তার গায়ে লাগে। পাঞ্জাবি টিকিট চেকারকে তাই অনায়াসে তিনি বলতে পারেন :

কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দেশী ভদ্রতা রে বাপু!

শ্রীপতি সামন্তর এই সংলাপটিই বনফুলের ভাষ্য। অর্থাৎ তিনি মনে করেন এখনো বাঙালি নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সাম্প্রতিককালে যে চালিয়াত মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছে তা বাঙালিত্বের যথার্থ প্রতিনিধি নয়।

বনফুলের গল্পের সাধারণ প্রবণতার বাইরের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গল্প *অর্জুন মণ্ডল*। এই গল্পের উপলক্ষও সংগ্রামশীল বাঙালি জীবনের বিপর্যস্ত রূপ।

অর্জুন মণ্ডল জীবনের প্রথম পর্যায়ে ছিলেন নিরক্ষর এক দরিদ্র জেলের সন্তান। নিজের অদম্য উৎসাহ, শিক্ষিত মানুষের ক্ষমতার প্রতি অগাধ আস্থা ইত্যাদির কারণে তিনি নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। কর্মজীবনে তিনি একজন দক্ষ কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন। শিক্ষার প্রভাবে তাঁর অবস্থা কিছুটা বদলালেও শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে অর্জুন মণ্ডল তাঁর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। অন্যায় অবিচার দেখলেই তার প্রতি প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতেন। নিজের মেয়েদের বিয়ে

দিয়েছিলেন এক জমিদারের সাত পুত্রের সঙ্গে। জমিদারের সাতপুত্রকে শহরে পড়াশোনা করতে পাঠালেন অর্জুন মণ্ডল। কিন্তু একসময় তিনি আবিষ্কার করলেন জামাইরা পড়াশোনা ছেড়ে আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে সাত জামাইকে এমন প্রহার করলেন যে বেয়াইয়ের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়ে গেল। গল্পে একে একে দেখা গেল যে তিনি কোথাও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। শেষ জীবনে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করে একটা সিন্দুক বানিয়েছিলেন। ওটা বানানোর উদ্দেশ্য ছিল এর ভেতরে তার সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশ বহন করবেন এবং প্রয়োজন হলে সিন্দুকের ওপর শুয়েও থাকা যাবে। 'জীবনে কোনো জিনিশই মনোমত হয় নি, এটাকে নিখুঁত করতেই হবে' এই ধরনের একটা জেদ তার মনে কাজ করেছে। সিন্দুকটি নিখুঁতভাবেই নির্মিত হল। অর্জুন মণ্ডলের এই সিন্দুকটি বহন করতে দুইজন কুলির দরকার পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সিন্দুকটা ট্রেনে তোলা গেল না। ট্রেন ছেড়ে দিল।

নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফুঠে উঠেছে এই গল্পে। জীবনের আদর্শ রূপকল্পনায় মহত্ত্ব থাকলেও তা জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সংগ্রামশীল তাঁরা অনেকেই নিজেদের জীবনটাকে অস্বাভাবিক আকারের সিন্দুকটার মতোই বহন অনুপোযোগী বানিয়ে ফেলেন। যুগের প্রকৃতির বিরুদ্ধ-পথের যাত্রীদের অনেকের জীবনের এমন মহৎ ট্রাজেডিই আমরা দেখে থাকি। অর্জুন মণ্ডলেরা এমনই চরিত্রের মানুষ যাদের প্রতি কেবল সমবেদনাই জানানো যায়। প্রকৃতির অমোঘ নিষ্ঠুরতার প্রতি বনফুলের অভিমান মূর্ত হয়ে ওঠে এভাবে।

মানুষের 'আত্মবিশ্বাস ও আত্মচেতনার অভাব'কেও বনফুল অনেক সময় কৌতুক-স্নিগ্ধ কটাক্ষ করেছেন। এই কটাক্ষও তাঁর অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গিজাত। *বিধাতা* নামের একটি ছোট্ট রূপকধর্মী গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে নানা মানুষ নানা কিছু প্রার্থনা করে বিধাতার কাছে। বিধাতা সবকিছু শোনেন এবং বলেন—আচ্ছা। তারপর ব্রহ্মার বাড়ি থেকে সরষের তেল এনে নাকে মেখে দেন এক ঘুম। সেই ঘুম আর কোনোদিন ভাঙে নি তাঁর। অর্থাৎ বনফুলের বিজ্ঞানমনস্ক মন বলতে চায় যে প্রার্থনা করে কিছু পেতে চায় কেবল আত্মবিশ্বাস ও আত্মচেতনার অভাবগ্রস্ত মানুষ।

এতক্ষণ বনফুলের কয়েকটি গল্প থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বনফুল-সৃষ্টিমানসের যে দিকটিকে পরিস্ফুট করে তোলার চেষ্টা হল সে-সম্পর্কে অল্প কথায় উপসংহার টেনে বলা যায় যে ছোটগল্পে তিনি মানুষের বিচিত্র মানবিক স্বভাবকেই টেনে এনেছেন। মানবজীবনের বৈচিত্র্যকে আঁকতে গিয়ে মাঝে মাঝেই শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে বনফুলের ছোটগল্পের শিল্পসাফল্য সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকদের মনে দ্বিধার ভাব রয়েছে। অনেক সময় নাটকীয় কৌশল বা আকস্মিকতার কারণে তাঁর ছোটগল্প স্বধর্ম হারিয়ে ঘটনামাত্রে পরিণত হয়ে পড়ে। আধুনিকতাবাদী সমালোচকেরা ছোটগল্পে এসবের অতিরিক্ত ব্যক্তির অন্তর্জগতকেই বড় করে দেখতে চান, পেতে চান ব্যক্তির একান্ত আত্মগত অনুভবকে। কিন্তু বনফুল কোনো অর্থেই সেই ঘরাণার লেখক নন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক। বনফুলের গল্পে উপস্থিত হয় তথ্য; কারণ তাঁর উপলব্ধিতে তথ্য কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর। সূক্ষ্ম একটা বিন্দু তথ্যকে তাৎপর্য দিয়ে গল্প করে তোলে। বনফুলের গল্প এই গুণে গুণান্বিত। তাঁর ভাষার সরলতা এই ধরনের গল্পের সাফল্যের কারণ।

বনফুলের ছোটগল্পে জীবন যেমন বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত তেমনি আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈচিত্র্য। মাত্র অল্প কটি লাইনে কয়েকটি দাগে ফুটিয়ে তোলা স্কেচের মতো স্পষ্ট করে তুলেছেন কোনো কোনো গল্প; কখনো বা বাংলা রূপকথার গল্প বলার ধাঁচে গল্প বলে গেছেন, কোনো কোনো গল্প আবার রবীন্দ্রনাথের *লিপিকার* মতো কাব্যিক ভঙ্গিতে এগিয়ে গেছে (যদিও লিপিকার কাব্যত্বের সঙ্গে বনফুলীয় কাব্যত্বের চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে সুস্পষ্টভাবে); কোনো কোনো গল্পে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তথ্যের বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছেন; একইরকমভাবে তথ্যের আকস্মিকতাজনিত চমকও তাঁর কোনো কোনো গল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য।

ছোটগল্প সৃষ্টিতে তাঁর সাফল্যের পেছনে তাঁর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষারীতিরও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। বনফুল সাধু এবং চলিত উভয় রীতির ভাষাই ব্যবহার করেছেন ; আর তা করেছেন বিষয়বস্তু বিবেচনা করে। যেমন হাস্যরস বা Humour সৃষ্টির জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন সাধু ভাষা। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ভাষারীতির প্রয়োগে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন।

> Humour জিনিশটা যেন এই সাধুভাষাতে বেশি হয়। কারণ humour-এর মধ্যে যে গাম্ভীর্য আছে একটা। humour জিনিশটি তো একটি ফচকেমি ফাজলেমি নয়, humour জিনিশটার মধ্যে একটা গম্ভীর জিনিশ আছে—সেই গম্ভীর জিনিশটা সাধুভাষায় বেশি ফোটে।
>
> —***কালপুরুষ*** পত্রিকায় বনফুল প্রদত্ত সাক্ষাৎকার

তবে কেবল humour প্রকাশের জন্য যেমন এই সাধুভাষারীতি উপযুক্ত বাহন তেমনি করুণ রস প্রকাশের জন্য তা একই রকম প্রযোজ্য।

বনফুলের গদ্য একদিকে সহজ, প্রবহমান আর অনাড়ম্বর বলে পৃথকভাবে গদ্যের ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রসঙ্গের সংস্পর্শে এলে তা হয়ে ওঠে ব্যঞ্জনাময়। এটাই তার ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বিশেষত্ব। এ-ছাড়াও কোথাও তথ্যবাহুল্য, কোথাও তত্ত্বপ্রবণতা, কখানো রোমান্টিক, কখনো ধ্রুপদীগন্ধিতা তাঁর গদ্যরীতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

বনফুলের ছোটগল্প সংখ্যায় বিপুল। স্বাভাবিকভাবেই সকল গল্প সমানভাবে সফল নয়। তবে তাঁর সফল ছোটগল্পও সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। বর্তমান সংকলনে তাঁর সব ধরনের চারিত্র্যমণ্ডিত সফল গল্পের প্রতিনিধিত্ব রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভিন্নরুচির্হিজনা :—এই সংস্কৃত শ্লোকের অর্থের মতো রুচির ভিন্নতার কারণে কারো কারো কাছে এই সংকলনের গল্প নির্বাচনকে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। তা সত্ত্বেও বর্তমান সম্পাদকের রুচির বিচারে বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প যদি পাঠকদের কারো কারো কাছে আদৃত হয় তাহলে সম্পাদকের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

আহমাদ মাযহার
১০/১ নিউ ইস্কাটন (পাঁচতলা), ঢাকা ১২১৭।

সূচিপত্র

বনফুলের গল্প (১৯৩৬)
সমাধান ১৯
বিধাতা ২০
সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ ২১
সুলেখার ক্রন্দন ২৫
ভিতর ও বাহির ২৭
মানুষের মন ৩০

বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮)
উৎসবের ইতিহাস ৩২
ক্যানভাসার ৩৫
পাশাপাশি ৩৭
মুহূর্তের মহিমা ৪০
শরশয্যা ৪৩
বিদ্যাসাগর ৪৬
অক্ষমের আত্মকথা ৪৭
মানুষ ৪৯
ভ্রষ্ট-লগ্ন ৫১
থিওরি অব রিলেটিভিটি ৫৬
পাঠকের মৃত্যু ৬০

ভুয়োদর্শন (১৯৪২)
দামোদর ৬২
বিবেক ৬৭

বাহুল্য (১৯৪৩)
জৈবিক নিয়ম ৭২
দিবা দ্বিপ্রহরে ৭৫
চিঠি পাওয়ার পর ৭৭

বিন্দু–বিসর্গ (১৯৪৪)
৮১ তিলোত্তমা
৮৬ নাথুনির মা

অদৃশ্যলোক (১৯৪৭)
৮৭ নিমগাছ
৮৮ তাজমহল
৯০ দুই ভিক্ষুক

আরো কয়েকটি (১৯৪৭)
৯১ স্মৃতি
৯৫ অর্জুন মণ্ডল

তন্বি (১৯৫২)
১১০ অহঙ্কার পাঁড়ে

সপ্তমী (১৯৬০)
১১৩ দুধের দাম

বহুবর্ণ (১৯৭৬)
১১৬ বিবর্তন

বনফুলের নতুন গল্প (১৯৭৬)
১১৯ ব্যবধান
১২২ শতাব্দীর ব্যবধান
১২৩ শ্রীপতি সামন্ত

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকড়াগ্রামবাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লিবালার সহিত, এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি। নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল, এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে, তার নাম পুষ্পমঞ্জুরি দিবি নাকি? তোর যত সব অনাছিষ্টি—

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ তো কালো, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তাছাড়া কীরকম যেন বোকাহাবা ধরনের, মুখে সর্বদাই লালা ঝরে। পুষ্পমঞ্জুরি নাম দেওয়া চলে না, তা ঠিক।

বৎসর দুই পরে।

ক্ষান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, কাহারও কাজকর্ম নাই, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল, এই দেখ না নীহারের অদৃষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে, তাও আবার এমন কদাকার—

শ্যাম বোস বলিলেন, আবার বলতে। বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কী। টাকা চাই প্রচুর।

হারু খুড়ো তামাকটাতে দু-টান দিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না। লোকে টাকাও চায়, রূপও চায় যে। চোখদুটো ছোট-বড় হয়েই আরও মুশকিল কিনা, কী যে হবে—

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল, কার চিঠি হে?

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম, বউ লিখেছে—বুঁচি মারা গেছে। কাল।

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু, বাছুর, শেষে মানুষ পর্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল, কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

কিন্তু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল, আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারি কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ করিলেন, বাবা, আমার নেড়ার যেন একটি টুকটুকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

হরিহর ভট্টাচার্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আজীবন তোমার পুজো করে এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সহায় হও।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, ঠাকুর, পাশ করিয়ে দাও। আজ সে বলিল, ঠাকুর যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ করে হরিরলুট দেব।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

হরেন পুরকায়স্থ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল, এগারটা ভোট আমার চাই। কালী পুরোহিত মোটারকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ভোটং দেহি, ভোটং দেহি—

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল, দেবতা জল দাও।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল, আমার একটিমাত্র সন্তান, ঠাকুর কেড়ে নিও না।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তি পিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন, বিধাতা, মাগীর বড় দেমাক। নিত্য নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধরে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও তো।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

দার্শনিক কহিল, হে বিধাতা, তোমাকে বুঝিতে চাই।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

চীন দেশ হইতে চিৎকার আসিল, জাপানিদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

বাংলাদেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল, কোনও সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা, পার্শ্বোপ্রবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বাসায় খাঁটি সরষের তেল আছে?

ব্রহ্মা বলিলেন, আছে। কেন বলুন তো?

বিধাতা। আমার একটু দরকার। দেবেন কি?

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) অবশ্য, অবশ্য।

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভালো সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ

এক

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভাসমিতি করিয়া, কবিতা লিখাইয়া, সর্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ অনায়াসে তাহাদের উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের বর্তমানে এসব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুসফুস গুজগুজ করিতেছে মাত্র, কারণ আর কিছুই নহে, শ্যামা নাম্নী ধোপানিটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।

যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমতো চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার মহাশয় সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমায় তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন। যাইবার সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। প্রবীণ হালদার মহাশয় কিন্তু প্রবলভাবে উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই হালদার মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল, তখন তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, শৈলেন কী কেলেঙ্কারিটাই করলে। ছি ছি—

এতৎপ্রসঙ্গে ভাদুড়ী মহাশয় য-ফলা আকার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করিলেন। বলিলেন, আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা।

পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, কোন ধোপানিটা বল তো হে?

দেখা গেল, হালদার মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাসস্থান, চেহারা, বয়স এবং স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, শৈলেন যে ভেতরে ভেতরে এত জড়িয়ে পড়েছে কে জানত? অতবড় ছেলে, অত বড় মেয়ে—

ভাদুড়ী মহাশয় আবার বলিলেন, ছ্যা-ছ্যা। লোক হাসালে!

খোঁড়া মল্লিক মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে, শ্যামা পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু-ধোপার নিকট মার খাইয়াছিল। মল্লিক মহাশয় শৈলেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু-ধোপাকে বলিলেন, কথাটা আর কারও কাছে প্রকাশ করিস নি, বুঝলি?

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করিল, কোন কথাটা? মল্লিক মহাশয় থতমত খাইয়া কোনো সদুত্তর দিতে না পারিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজেদের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন।—কেন সে পিরু-ধোপার নিকট গিয়াছিল? এ কী আহাম্মকি!

সুতরাং মল্লিক মহাশয়ের এই কাঁচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি মুকুজ্জে মহাশয়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিরুর বাড়িতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল, মল্লিকের কথায় কিন্তু মনে করিস নি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে।

এবারও বিস্মিত পিরু কহিল, মানে? কী বলেছেন? মুকুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, মানে? ও কিছু নয়, বুঝলি?—বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন, পিরু একেবারে খেপে আছে হে। মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে।

সকলে চটিয়া মল্লিকের উপর খড়্গহস্ত। বেচারি মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা-একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিরুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল, তখনই ভাবিল এবং হাসিল—মল্লিক মহাশয় আজকাল সিদ্ধি খাইতেছেন।

যাই হোক, শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার, মুকুজ্জে প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে ভিতরে অবশ্য ভাদুড়ী হইলেন কৌতূহলী, মুকুজ্জে উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ।

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাত ছোট নয়। অনেকগুলি বনিয়াদি ভদ্রগৃহস্থের সেখানে বসবাস। গোটা-দুই চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বরবাবুর বিপক্ষদলও একটি ছিল, এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী, কর্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন, সেইহেতু তাঁহার বিপক্ষদলটি বেশ ভারীও ছিল। তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-রজকিনী-প্রসঙ্গটা তাঁহারা বেশ-একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল, হালদার মশাই বলে বেড়াচ্ছেন যে, শৈলেশ্বরবাবু নাকি খুলনা গেছেন।

হুঁকাতে টান মারিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, হালদারকে বলে দিও হে, সূর্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি। খুলনার চেয়ে ঢাকা বললে আরও মানাত।

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন, আহা, চট কেন! এ-কথা হালদার বলবে না তো কে বলবে বল? ওই দলটার সবকটা পাজি। বুড়ো মিত্তিরটা সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি আবার মাস্টারি করেন।

ভাদুড়ীর বা কী কম। রোজ ওঁর ময়নাদিঘির ধারে বেড়াতে যাওয়ার অর্থ কী?

বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন, সব ঘুঘু।

পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!—এই বলিয়া রায় মহাশয় হুঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

দুই

ফলে অচিরকাল মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ী মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায় মহাশয়, রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুকুজ্জে মহাশয়, মুকুজ্জে মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙ্গুলী মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শৈলেশ্বরবাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা-সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর-একটি জনমত ক্রমশ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে, ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও যান নাই—কারণ স্টেশনের কর্মচারীরা কেহ তাঁহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি পদব্রজেই কোথাও গিয়া স-রজকিনী আত্মগোপন করিতেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর-গলায় বলিতে লাগিলেন—আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানিটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠামাঠি দৌড়চ্ছেন।

তিন

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বরবাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে ভীত-চকিত শৈলেশ্বরগৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকূল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার সমবয়স্কা গৃহিণীগণ বেশ রসায়ন দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল।

ওমা, কী ঘেন্নার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না!—বলিয়া অনেকেই গালে হাত দিল এবং ঘাড় কাত করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন, পুরুষমানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই। একবার চোখের আড়ালে হয়েছে কী—ব্যস!

হালদার-গৃহিণী একটু সহানুভূতির সুর দিয়া বলিলেন, উনি তো বলছিলেন—শৈলেশ্বরবাবু খুলনা গেছেন।

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, থাম লো থাম। আমার কর্তাটিও ওই দলে। সব চোরে চোরে মাসতুত ভাই। বলে দিয়েছি এবার স্পষ্ট করে যে, ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবে দাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ করে বসে থাকবে। বুড়ো মিনসের অত আড্ডা দেওয়া কেন?

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর ফাঁদি-নথ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। মরিয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, কোনোদিন কিন্তু ওঁকে শ্যামা-ধোপানির সংস্রবে দেখি নি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিরু-ধোপা। শ্যামা তো কোনোদিন আসেও নি আমাদের বাড়ি।

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, এই বুদ্ধি না হলে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন! তারা যা করবে, তা কি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে নাকি? শৈলেশবাবু হলেন একটা ঘাগি মোক্তার। তার সঙ্গে চালাকি! পুরুষমানুষদের বশে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, নজরবন্দি করে রাখা। চোখে চোখে রাখা। যা বললেন আমাদের গাঙ্গুলীদিদি, চোখের আড়াল হয়েছে কী ব্যস্।

চার

শৈলেশ্বরবাবুর দুই পুত্র মাধব ও যাদব। মাধব বি.এ. পাশ করিয়াছে। যাদব আই.এ. পড়িতেছে। তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু কী করিবে? তাহাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটা ঝুনা-ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেই কয়েকজন ছোকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে লাগল।

এদিকে বৃদ্ধদের দুইপক্ষের মধ্যে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল। হালদার মহাশয়ের উপর ধনী রায় মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নামে ডাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিয়াছেন। ভাদুড়ী মহাশয় মানিক পোদ্দারের নিকট হ্যান্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন, গাঙ্গুলী মহাশয়ের উসকানিতে পোদ্দারের পো ভাদুড়ী মহাশয়কে চাপ দিতে শুরু করিয়াছে। মল্লিক মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষদলের কাহারো বাড়ি আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইতে 'সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা' নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারিখানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি কী করিয়া বিপক্ষ দলের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে খেপিয়া স্বদলের কয়েকজন পাণ্ডা স্থানীয় পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোস্টমাস্টার বেচারা এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপার মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, Everything is fair in love and fight—শেষপর্যন্ত লড়ে দেখব, তবে ছাড়ব।

পাঁচ

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

হঠাৎ শ্যামা ধোপানি কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ি গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোনো কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীণের দল কতকটা

হতভম্ব হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর অবশ্য তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন—ভূতের কাছে মামাদোবাজি ! মামার বাড়ি ! পিরু ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়ই। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে তো !

শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়, কূপে পড়িয়া। গ্রামের একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কূয়া ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

সুলেখার ক্রন্দন

সুলেখা কাঁদিতেছে।

গভীর রাত্রি—বাহিরে জোছনায় ফিনিক ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা। ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া একফালি জোছনা জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুরা অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন ?

প্রেম ! হইতে পারে বইকি। এই জোছনা-পুলকিত যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়নপল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ, প্রেম হইতে পারে, সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল তো। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অরুণ-দা নামক যুবকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে মনে। এই শ্রদ্ধাই স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাকে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বরমাল্য অর্পণ করিল।

হয়তো এই গভীর রাত্রিতে জোছনার আবেশে সেই অরুণ-দাকেই তাহার বারবার মনে পড়িতেছে। নির্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়তো এই অশ্রুতর্পণ। তবে ইহাও ঠিক যে, তাহার গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্তাটি সে অরুণ-দাকে কখনও জানায় নাই। মনে মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয়, কিন্তু বিপিন—বিপিন। একেবারে খাঁটি বিপিন। এবং আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালোও বাসিয়াছিল। ভালোবাসিয়া সুখীও হইয়াছিল। সহসা আজ নিশীথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দাকে মনে পড়িয়া আঁখিপল্লব জল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীতপ্রবণ ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। সে সম্বন্ধে চট করিয়া কোনো মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুত স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কোনোকিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয়, বয়স বোধহয় উনিশ-কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহারও বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া

পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনের বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়।

সুতরাং নারী-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে বেকুবের মতো ফস করিয়া কিছু-একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্তত করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যতদূর জানি, তাহাতে তাহাদের ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মতো যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অরুণ-দার কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর-একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। শিশুটির মৃত্যুর পর সুলেখার দুই দিন 'ফিট' হয়—ইহা তো আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমলহৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে।

কিন্তু হ্যাঁ, আর একটা কারণও হইতে পারে। পুত্রশোক-প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন—কিন্তু ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বিগত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা-হাউসে দেখানো হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নরনারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভালো লাগে, প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য লোক এই বিপিন! কিছুক্ষণ আগেই সিনেমায় লাস্ট শো হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নিচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল। হয়তো তাহাতেই সুলেখার শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়? সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য সিট বুক করিতে গিয়াছে।

হইতে পারে। তরুণী-পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক না বিপিন লোমশ—সে মানুষ তো! তা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালোবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকেরা—বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমাঘটিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে, সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমনকি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড়

পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণত যাহা করে, বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণত যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন, সুলেখা সম্ভবত তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে।

কারণ যাহাই হউক, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ। রাত্রি গভীর এবং জোছনা মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ,—অর্থাৎ করুণতর। কোনো সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন, তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং আকাশপ্লাবিনী হউক না কেন, এ বিষয়ে খুব সম্ভবত আমরা একমত যে, এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ি কাঁদিলে আমরা এই আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়তো বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে, এবং এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না নির্ণয় করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না, এমনকি অরুণ-দাকে জড়াইয়া একটা শস্তাগোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, কেন, নয়? এমন চাঁদনি-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে না কি? ওই তো দূরে 'চোখ গেল' পাখি অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে। সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্নবিহ্বল—চতুর্দিকে জোছনার পাথার! এমন দুর্লক্ষণে অরুণ-দার কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব না অপরাধ? মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবত। কিন্তু এ কী!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?

না। বড্ড কনকন করছে।

এই পুরিয়াটা খাও তাহলে। ডাক্তারবাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কী হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষ্মীটি।

জোছনার টুকরাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

দেখিলেন তো? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব!

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সবসময় সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চালচলন চিন্তাপ্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং কৃচিৎ সায় দেয়। দুইভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোরবাবু উকিল। খুনিকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরিব প্রজার সর্বনাশসাধন,

জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম-প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন বিধবার সম্পত্তিঘটিত একটা মামলা তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু উদ্বিগ্ন অন্যমনস্ক আছেন।

এমন সময় আর-একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি কোনো বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, 'আইন-সংক্রান্ত কোনো পরামর্শ দিতে হলে 'ফি' নিয়ে থাকি, তা জানেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—কত দিতে হবে আপনাকে?'

'বত্রিশ টাকা!'

'আচ্ছা, বেশ—।'

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, 'আমার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি তারও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।'

'ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?'

'হ্যাঁ, ছেলের কোনো রোগ নেই।'

'আমার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চান', বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

'এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জানতে আশা যে, যদি বংশ লোপই পায়, তাহলে শেষপর্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?'

নস্যের টিপটা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন, 'ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোনো বাধা নেই।'

'তা তো নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাকিলেও সবসময় কি সব জিনিস করা সম্ভব?'

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সেন্টিমেন্ট অনুসারে চললে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই! এইসব বাজে সেন্টিমেন্ট নিয়েই তো আমরা ডুবতে বসেছি!'

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেন্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, 'ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তাহলে সম্পত্তি কারা পাবে?'

আইন অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলতে ছাড়িলেন না : '—ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার তো শ্মশান। আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বললাম—আপনার সেন্টিমেন্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।'

আগন্তুক বলিলেন, 'না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই তো আপনার কাছে আসা।'

বত্রিশ টাকা ফি দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

* * *

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ি আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া-চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া-চাকরটা ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপরে নাম লেখা—'সরোজিনী দেবী।'

ব্যবহারে বোঝা গেল ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তাছাড়া তরুণীর ব্যবহারে সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু কোথায়?'

'কাছারিতে।'

'কখন আসবেন?'

'জানি না।'

তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

* * *

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক হইয়া গেলেন, 'এ কী সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে।'

'ও বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না।'

'কেন? ব্যাপার কী?'

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

'পোষাবে না, মানে?'

'ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমিও তো মত দিয়েছ।'

'আমি মত দিয়েছি,—মানে?'

'ওরা একজন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। তুমি নাকি বলেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভালো—'

রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে। হতবাক রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি তুমি বলেছ, বাবা?'

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচাখোঁচা চিরুনি-সম্পর্ক-বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মতো পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বাগোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠী। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাইল কাটলেট' বানাতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন ! মোটেই তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধহয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম.এ. পাশ—নরেশ কেমিস্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমানভাবে নগদ টাকাও দিয়া গিয়াছিলেন। যে-বাড়িতে ইহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। এত বড় যে ইহাতে দুই-তিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ বড় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন—'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন—নির্মলা সত্যিই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এই মাত্র !

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও এই বাড়িতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালোবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোটভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের স্ত্রী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই—'আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।' পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন—'বাকি অর্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক !' তাহাই হইল।

পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কী?

পল্টু নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুরগি সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোনো নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ—আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালোবাসিতেন। এ-বিষয়ে উভয়ে কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ; তিনি স্বভাবতই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাতদিন কাটিয়া গেল জ্বর ছাড়িল না তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—'আমার মনে হয় একজন ভালো কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হত?'

'বেশ দেখাও—'

কবিরাজ আসিলেন—সাতদিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল; পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, 'আচ্ছা একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্টিটা দেখালে কেমন হয়? কী বল?'

'বেশ তো! তবে, যাই কর এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড!'

'তাই নাকি?'

পল্টুর কোষ্ঠী লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—'মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।' কী করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—

'কবিরাজি ওষুধ তো বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব নাকি?'

'তাই ডাকো নাহয়—'

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে—'মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়!'

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, শুনিয়াছিল তারকেশ্বরে গিয়া ধরণা দিলে দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক!

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—'আমি একবার তারকেশ্বর চললাম, ফিরতে দু-একদিন দেরি হবে।'

'হঠাৎ তারকেশ্বর কেন?'

'বাবার কাছে ধরনা দেব—'

নরেশ কিছু বলিলেন না, ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।'

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন-দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—'বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বললেন যে, রোগীকে যেন ইনজেকশন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলেই সেরে যাবে।'

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুলবেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ানো চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইনজেকশন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের সগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন। 'ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে।'

'অ্যাঁ, বল কি!'

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মতো পরেশ ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

'হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আর ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগগির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—'

এদিকে নরেশ পাগলের মতো চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—'পল্টু খাও—খাও তো বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—'

তাঁহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল।

উৎসবের ইতিহাস

এক

সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

—সাণ্ডেল মশাইকে আরো চারটি পোলাও দাও।

—আন্—আন্—ওরে এ দিকে লুচি নিয়ে আয়—লুচি—লুচি।

—মাংস আপনাকে দেব আর একটু?

—না—না—সে কী কথা ! দাও খানিকটা মাংস—

—ডাল—ডাল চাই—ডাল।

—ছ্যাঁচড়া—ছ্যাঁচড়া।

—ওহে ছ্যাঁচড়া রেখে তুমি পায়েশটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও দিকি—

—এ হে হে জলের গেলাশটা পা লেগে পড়ে গেল যে। তোমরা দেখেও চলতে পার না? উটের মতো চলছ সব।

—এই রসগোল্লা এদিকে এস—মুখুজ্জে মশাইকে গোটা-আষ্টেক দাও—খাইয়ে লোক উনি—

—তুমি যাও তো হে—কয়েক 'পিস' ভালো দেখে মাছ বেছে বেছে নিয়ে এসো তো—মিত্তির মশাইকে দাও—

—দেখো হে, আখতার মিঞা আলাদা বসেছেন ব'লে যেন কিছু বাদ না পড়ে। নরেন তুমি ওঁর কাছেই থাকো—

—সিঙ্গি মশাইকে খানিকটা ছ্যাঁচড়া দিয়ে যাও—চাটনিও—

নানা আকৃতির জন তিরিশেক আহারে প্রবৃত্ত।

জন পাঁচ-ছয় ছোকরা পরিবেশন করিতেছে।

স্বচক্ষে দেখিলে তবে বিশ্বাস হইবে।

না দেখিলে মনে হইবে শতখানেক লোক ভিতরে দাঙ্গা করিতেছে।

দুই

ঠিক ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়টি করুণ রসাত্মক।

কিন্তু সত্য!

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের নিকট টাকা ধার করিতেছেন। অসহায় মল্লিকের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে তো।

দেখা গেল মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক।

চাহিবামাত্র টাকাটা ঝড়াৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"ফিষ্টি একটা করতে হবে বইকি! ফিষ্টি না করলে চলে! এ কটা টাকা-যদি সিক্‌স্ পারসেন্টই দাও—কদিন যাবে শুধতে! অমন তৈরি ছেলে তোমার! বড় ভালো ছোকরা নরেন—বড় ভালো-ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও—দেখো—"

মুখুজ্জের অর্থে উৎসবের আয়োজন হইল।

পোলাওটা সামান্য একটু ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ রস-ভঙ্গ হয় নাই।

সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়াছে।

তিন

ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা-পরম্পরা একটু জটিল।

সংক্ষিপ্ত তালিকাবদ্ধ আকৃতি নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(১) অনন্যোপায় নরেন মল্লিক (প্রবীণ মল্লিকের পুত্র) দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া সাগ্রহে বিশু সান্ন্যালকে তৈলাক্ত করিতেছে।

(২) তৈলনিষিক্ত বিশু সান্ন্যাল দিশাহারা হইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।
(৩) খবরটি গোপন রহিল না।
(৪) ফলে, বিশু সান্ন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমশক্তিশালী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন এবং একখানি পত্র লিখিলেন।
(৫) উভয় পত্রই আখতার আলির হস্তগত হইল এবং সমস্যাকুলচিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।
(৬) বিশু সান্ন্যালকে সুচারুরূপে তৈলাক্ত করিবার পর নরেন মল্লিক আবিষ্কার করিল যে, তাহার তৈল–নিষেক–শক্তি মোটেই নিঃশেষিত হয় নাই। এখনও সে বহুলোককে তৈল–সুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ করা অনুচিত।
সে গিয়া 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়কে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "এইবার কাহাকে তৈলাক্ত করি বলুন তো। আখতার আলিকে গিয়া ধরিব কি?"
ঈষদ্ধাস্যসহকারে মুখুজ্জে বলিলেন, "সুবিধা হইবে না। আখতার আলি নিরামিষ তৈল পছন্দ করেন না। তুমি বরং সিঙ্গির কাছে যাও। পরাণ সিঙ্গি ঘাগি লোক। যদি রাজি করাতে পার—নির্ঘাৎ লেগে যাবে।"
(৭) অবিলম্বে তৈল ও তুলি লইয়া নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হইল এবং তাহাকেও যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত করিল।
(৮) তৈলার্দ্র সিংহ মহাশয় নরেনকে আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া পানু মিত্রের নিকট গেলনে।
(৯) ঘাগি–ঘুঘু–সম্মিলন হইল। পানু মিত্তির ঘুঘু। বোঝা গেল তিনি কেবলমাত্র তৈল–নিষেকে নরম হইবার পাত্র নহেন। তিনি নরেন মল্লিকের আপাদমস্তক ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি সিংহ মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কর্ণকুহরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কী সব বলিতে লাগিলেন। ঘাগি–ঘুঘু–সংবাদ নরেনের অগোচর রহিয়া গেল।
(১০) প্রকাশ্যে পানু মিত্র নরেনকে কেবল বলিলেন, "শুধু হাতে হবে না হে। একটা ভালোগোছের ডালি চাই—বুঝলে? ডালিটি নিয়ে কাল বিকেলে এসো—দু বোতল হুইস্কিও এনো—"
(১১) ঘাগি সিঙ্গি মহাশয় ঘুঘু মিত্তিরের নিকট গোপনে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থাৎ নরেনের পিতার কর্ণগোচর করিলেন।
প্রবীণ মল্লিককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হইতে হইল।
(১২) পরদিন ঘুঘু–সমভিব্যাহারে স–ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।
(১৩) ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণিজনসুলভ। তিনি নরেনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 'ফোন' করিলেন।
(১৪) সমস্যাচ্ছন্ন আখতার আলি বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতেছিলেন—এমন সময়—ট্রিং—ট্রিং—ট্রিং—ফোন বাজিয়া উঠিল।

(১৫) আখতার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সমস্যা বিদূরিত হইল।
(১৬) নরেন নির্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।

চার

যে ঘটনাটি এখনও ঘটে নাই কিন্তু যাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহার উল্লেখ না করিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

তাহা এই—নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পাণি পীড়ন করিতে হইবে।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়াই ঘুঘু মিত্তিরের মধ্যস্থতায় নরেন সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই নিয়োগকর্তা আখতার আলির জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে—অর্থাৎ নরেনের এতদিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

সংক্ষেপে, সে চাকরি পাইয়াছে।

হউক কেরানিগিরি—হউক বেতন তিরিশ টাকা—

চাকরি তো!

প্রস্পেক্টও আছে।

উপরোক্ত ভোজনোৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

পাঁচ

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্তত করিয়া সর্বশেষে উল্লেখ করিতেছি। নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম. এ.।

ক্যানভাসার

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সে সময়টিতেই ক্যানভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিশটা সে অপছন্দ করে এবং এইসব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন। তিনি বলিলেন, যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?

নিদারুণ কথা।

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাশ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

মাজন চাই—ভালো দাঁতের মাজন—

ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট সুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যানভাসার হীরালাল।

ক্যানভাসার হীরালালের এই পল্লিগ্রামে আসবার কথা নয়। তাহার শহরে যাইবার কথা। যাইতেও ছিল ; কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লিগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু বিজনেস হয়, এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল, আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশায়?

মাজন আছে—ভালো দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভালো হয়ে যাবে মশাই, ভালো মাজন আছে—

তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—

ব্যবহার করে দেখুন—ভালো মাজন—

নিমের দাঁতন চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল, কচু—

হাসিয়া হীরালাল বলিল, আজ্ঞে না—ভালো মাজন। ব্যবহার করে দেখুন—

হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল, আপনার দাঁতগুলি তো খাসা। এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈরব একবার পিচ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

মাজন নেবেন কি এক কৌটা?

বিকৃত-মুখে ভৈরব বলিল, স'রে পড়ুন মশায়। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?

বলিয়া সে নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল, বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল, তাতে আপনার কী? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে। ওসব মাজন-ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।

হীরালাল ক্যানভাসার হইলেও রক্তমাংসের মানুষ। বলিল, আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য ; তাহার পেটে বিদ্যা নাই, তাহা সত্য। কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে, কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এইসব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকেই খেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দুষ্কর—দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ ফেলিয়া ভৈরব কহিল, বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে।

গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশায় আপনি শুনি?

ভীমগর্জনে ভৈরব কহিল, বেরিয়ে যান—

আপনার মতো ঢের মিঞা দেখেছি—

ইহার পরই ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল!

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর-এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফজোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, হ্যাঁ, ওটাও। ভালো কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মারধর করছেন মশায়? গরিব মানুষ—এই করে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যফূর্তি হইলে সে বলিল, আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন।

পাশাপাশি

এক

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চা ও পরনিন্দা করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাশ করিয়াছি, বহুস্থানে চাকরির জন্য দরখাস্ত দিয়াছি—এমনকি কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকি আছে। স্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততঃপক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ মাছির জ্বালায় অস্থির! যেই একটু শুইব ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে। এত মাছি আর এত গরম। সুস্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে ঠায় বসিয়া চিন্তা করাও ত মুশকিল! শুইলেই মাছি! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারিবার আরক ছিটাইয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়তো হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন "আচ্ছা চিন্তাশীল লোক ত!"

পেটের চিন্তার মতো এত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিনরাত সেই চিন্তাই করিতেছি। আমি চিন্তাশীল নই, চিন্তাগ্রস্ত।

.....ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলকাতা যাইব। কলকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয় কলকাতাই বেস্‌ট ফিল্‌ড! চাকরিও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এতকাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে আমি কোন জমিদার-তনয়। তাহা নয়। বাবা শৌখিন লোক ছিলেন এবং সেই জন্যই সম্ভবত কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুই

এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে বিকাশবাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোন-ঝির খুড়শাশুড়ির ভাইপোর পিস্‌তুতো শালার আপন ভায়রাভাই এই বিকাশবাবু। রীতিমতো অঙ্ক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম সাক্ষাতেই তাহাকে বলিয়া বসিলাম, "কি ভায়া, চিন্‌তে পারছ!" ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, "অনেক দিন পরে কিনা! তাই একটু—মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?"

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম, "নাঃ চিন্‌তে পার নি দেখছি। চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে। মানে বাঁকুড়ারও ইন্‌টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের", বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে ফরমুলাটা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম, "তুমি হ'লে গিয়ে আমার হেমন্তর ভায়রা ভাই। আপন লোক সব কলকাতার গলি-ঘুঁজিতে পড়ে আছে—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠে না। এবার মনে করলাম যাই একটু বিকাশভায়ার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

কুলির মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "থাকবেন নাকি এখানে?"

"বেশি দিন নয়—দু-চার দিন!"

"ও।"

কুলি বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম বিকাশভায়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ধৈর্য অবশ্য বেশিক্ষণ টিকিল না। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। কেহ বলে, "লজেঞ্জস্ দাও!" কেহ বলে, "ঘুড়ি চাই।" কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল—তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুশি হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরাই শুধু জমাইতে পারে!

বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

তিন

তিন দিন কাটিল। কলকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত একজনও নাই। সহপাঠীগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্বে থাকিতাম তাহা এখন "ডাইং ক্লিনিং" হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না—আমিও কাহাকেও চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্যুপরি তিন দিন এই রূপে কাটিল। বিকাশবাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন, যেন 'লেট' না হইয়া যায়। নিজেই গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—বাজার করিয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে ফিরিয়া আসেন, বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসিয়া যান। কোনো রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপরাইয়া কলতলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন, "ভাত বাড়। ওগো শুনছ—লেট হয়ে যাবে—পৌনে ন'টা হ'ল—যেতেও ত আবার খানিকক্ষণ লাগবে—" তাহার পরই উর্ধ্বশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোন দিন রাত্রি দশটা, কোন দিন এগারটা। সুতরাং বিকাশবাবুর সহিত আলাপ বেশিক্ষণ জমাইবার অবসর পাই না। ভাবি—"কাজের মানুষ।" বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে—রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকরিও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

চার

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক যখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে তখন বলিলাম, "ভায়া আমি তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।"

"আমার সঙ্গে? কেন?"

"একটা কথা ছিল। মানে—"

"তা হ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার 'লেট' হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকারটা কি?"

"অর্থাৎ—" কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

"টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না,—সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।"

"না—না, টাকাকড়ি চাই না। আচ্ছা, চল ট্রামেই বলব এখন!"

"ট্রামে ত আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

"বেশ ত! চল আমিও হেঁটে যাই। কত দূর?"

"ইডেন গার্ডেন।"

"ইডেন গার্ডেনে আপিস? কিসের আপিস?"

"আপিস কে বল্‌লে আপনাকে!" বলিয়া বিকাশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন!

"তবে ?"

"আরে রামঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই ?"

"কোথা যাও, তা হ'লে ?" একটু ইতস্তত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে যাই !"

নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিকাশবাবু বলিয়া চলিলেন, "বাবা কিছু টাকা Fixed Deposit রেখে গিয়েছিলেন—তারই ৪০ টাকা সুদ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারি নি। অথচ এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম ! চলুন—'লেট' হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না !"

উভয়ে আবার খানিকক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশবাবু আবার বলিলেন, "বাড়িতে কথাটা ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন ! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেতে 'অ্যাপ্রেন্টিসি' করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয় !"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে আসি। বুঝলেন না ? বাড়িতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে সারাদিন ব'সে থাকা অসহ্য ! সারাক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে। বাঁশি কিনে দাও,—লজেনস্ দাও, পুতুল দাও। পাশের বাড়ির ছেলের লাল জামা হয়েছে সেই রকম জামা ক'রে দাও। গিন্নির নানা রকম আবদার আছে !—সরে পড়ি ! বুঝলেন না !"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়িতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না ! সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে ! নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়িতে থাকলে হৈ হৈ ক'রে একটা ডাক্তার-ফাক্তার ডাকতে হ'ত ধার ক'রেও ! ছিলাম না—নিশ্চিন্ত !—চলুন একটু পা চালিয়ে—ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে—সেইটেতে গিয়ে শুয়ে-বসে সারাদিনটা—বুঝলেন—'লেট' হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে সেটা দখল করে—বুঝলেন !"

পাশাপাশি দুই জনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায় !

মুহূর্তের মহিমা

এক

দেখা যাক, এইবার কী করে।

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরগন খাঁ হাতের গুলি পাকাইতে লাগিলেন। আসল নাম অবশ্য গুরগন খাঁ নয়, আসল নাম কালীকান্ত। কিন্তু গুরগন খাঁ নামেই প্রসিদ্ধি। কারণ তিনি পুরাকালে চন্দ্রশেখরে গুরগন খাঁর চরিত্র অভিনয় করিয়া বহু নর-নারীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছিলেন।

বর্তমানে গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।

মুখে সুচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তদুপযুক্ত গোঁফ।

রঙ বাদামি।
চক্ষু তীক্ষ্ণ।
বুকময় চুল।
—ইহা কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।
আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান শিক্ষিত।
জমিদার।
অপত্নীক।
মাংসাশী।

দুই

শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী।

তাহার একটি রোগা গরিব–গোছের ছোকরাকে পছন্দ।

গুরগনের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে থাকিতে ওই পিলে–রোগা ছেলেটা!

ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গে পেশি আকুঞ্চিত হইয়া উঠিত।

এক চড় মারিলে তাহার মুন্ডটা যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই!

কিন্তু মুন্ড উড়াইবার চেষ্টা গুরগন করেন নাই।

বরং ভদ্রভাবেই নানাপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

অর্থাৎ ভাঙা মোটা গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধিয়াছেন।

জরিদার নাগরা পরিয়াছেন।

স্নো ঘষিয়াছেন।

জুলফি পর্যন্ত রাখিয়াছেন।

কিন্তু অবিচলিতা শ্রীমতীর দৃষ্টি রোগা ছোকরাটির উপরই স্থির নিবদ্ধ।

গুরগন আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।

তিন

আজ বৈকালে শ্রীমতী আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ছিলও। কিন্তু সে থাকা না–থাকারই সমান।

গুরগন বেশ বুঝিতেছিলেন, তাহার মন পড়িয়া আছে সেই রোগাটার কাছে। গুরগন ডাকিয়াছেন বলিয়া সে আসিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে গুরগনের অবাধ্যতা করিয়া এ গ্রামে টেকা মুশকিল।

হঠাৎ গুরগন খেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,
আজই চাই,

এখনই চাই;
তাহা না হইলে—এই রিভলভার।
তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।
শ্রীমতী হাস্যদীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।
তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কী করবেন আপনি?
ভীমগর্জনে গুরগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।
তিনু মানে সেই রোগা ছোকরাটি।
শ্রীমতী বলিল, আচ্ছা তাহলে আমাকে ভাববার সময় দিন একটু। একা ভেবে দেখতে চাই। আপনি একটু ও-ঘরে যান। যাবার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।
আবেগকম্পিত কণ্ঠে গুরগন কহিলেন, কতক্ষণ ভাবতে চাও?
দশ মিনিট।
বেশ।
স্খলিতচরণে গুরগন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চার

দেখা যাক—এইবার কী করে!
স্ফীতপেশি গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।
দশ মিনিট চিন্তার পর শ্রীমতী বলিয়া গিয়াছে যে, আজ রাত্রে সে আসিবে। ঠিক দশটার সময় যেন গাড়ি পাঠানো হয়।
ঘড়ির দিকে গুরগন চাহিয়া দেখিলেন—মাত্র ন'টা বাজিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।
উহ্!
পিপীলিকায় দংশন করে নাই।
অধীর গুরগনের প্রণয়ীসুলভ অনুচ্চ কাতরোক্তি।
হঠাৎ গুরগনের হাসি পাইল—ভয়ঙ্কর হাসি পাইল।
রোগাটার কী দশা হইবে? আহা বেচারি!
বেচারি?
দারুণ ক্রোধে গুরগনের দন্তগুলি কড়মড় করিয়া উঠিল।
স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল বাঁদরটার!
আবার দর্পণে গুরগন নিজের পেশিবহুল দেহটার পানে চাহিলেন।
মুখে স্মিত হাস্য।

পাঁচ

দশটা বাজিয়া গিয়াছে।
গাড়ি চলিয়া গিয়াছে।
ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে গুরগন সাগ্রহে প্রতীক্ষমাণ।
মনের অবস্থা?
উপমা দিতে হইলে বলিতে হয়, যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।

সহসা গলির মোড়ে গাড়ির শব্দ।

দুইটা ঘোড়ার আটটা ক্ষুর যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

থামিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে।

পরদার কাছে আসিয়া একটু থামিল, তাহার পর পরদা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শ্রীমতী।

শ্রীমতীর মুখ দেখিয়া গুরগনের উদ্যত প্রেম স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সজলকণ্ঠে শ্রীমতী বলিল, আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে এলাম।

কী কথা?

তিনুক আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো?

না।

দুইজনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত।

সেই কয় মুহূর্তে কী ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরগন বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরগনের মনে হইল, এ কী করিলাম? হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল? কে এ?

আশ্চর্য!

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার ক্ষুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শরশয্যা

এক

শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয়ে হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ডু হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

... ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন ... দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কী? সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া

হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি... কলেজের স্পোর্টস-এ সকলের সেরা ছিলাম—কিন্তু শরীরের শক্তি সংগ্রহ করিয়া কী লাভ, যদি নারীত্বের মর্যাদা না রক্ষা করিতে পারি?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চিৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কী হইবে, উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটিমিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলি আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি-সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলো তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি! দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। একজন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে... ছি ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়—বহু সন্তরণশীল, ব্যায়ামশীল, লম্ফনশীল, বীরপুরুষদের ছবি দেখা... ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেহের যৌবন চঞ্চল হইয়া ওঠে অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত না মৃত! অভিভূতের মতো বসিয়া রহিলাম। শাঁৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর-একটা গাড়ি আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-স্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্তী হইয়াছে। স্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এদেশে আর কখনও আসি নাই। চাকরির চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকরি জুটিতে পারে।

দুই

এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। স্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম, শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম, হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌঁছানো গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন—দ্বিতলে একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়া দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন

আবার কুরুক্ষেত্র-সমর বাধিয়াছে।

নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট, সুতরাং আমার পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কীরকম পাকেচক্রে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রৌপদীধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবি করিতে হইতেছে। একটা ঘুসিতে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নাসিকা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে

অপূর্ব কৌশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ হেঁ হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্যচ্যুতিকর ব্যাপার। সহসা সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আর দুর্যোধনকে দেখিয়া দেঁতো হাসি হাসিতে হইবে না—দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না। ধৃতরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছি। শরশয্যা ফুলশয্যা নহে। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি লোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছে। সহসা মনে হইল আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না ! কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা ! স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট। তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টর্চটা জ্বালিয়া দেখি সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছানো রহিয়াছে ! অগুনতি ছারপোকা ! দেওয়াল বাহিয়া সারি-সারি আরও নামিতেছে। সর্বনাশ ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া যাইব কিনা ভাবিতে লাগিলাম, অদ্ভুত স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল ! আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। একেবারে অক্ষৌহিণী।

চার

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চলিলাম। বাহিরে চাহিবামাত্র কর্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম ঠিক নিচের গলিটাতে চেক-কাটা লুঙি-পরা একটি গাঁট্টাগোট্টা-গোছের লোক একটি বাড়ির জানালায় উঁকি দিয়াই চোরের মতো সরিয়া গেল। যে-জানালায় লোকটা উঁকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার দ্বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে, পরনে একটি আধময়লা কাপড়—কোলের কাছে একটি শিশু। ঘরে আর কেহ নাই... চকিতের ভিতর খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে। সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে যেন জীবনে সে আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতিটি পেশি আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে। রাসকেল ! সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বৎসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব ! আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড ! কিন্তু উপায় কী ! ইনিই আমার শ্বশুরের পরিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল, 'আপনার কাছেই এসেছি, বিমলবাবুর জামাই আমি !'

ভদ্রলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'ও, বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি ?'

'ওই হোটেলে—'

'আচ্ছা, কাল সকালে দেখা করো—'

ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।

বিদ্যাসাগর

বিদায় লইবার প্রাক্কালে বিনীত নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গেল, ওই মোড়টায় ডিসপেনসারি খুলেছি, মাস্টার মশায়, দয়া করে যাবেন মাঝে মাঝে।

আচ্ছা।

স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

পুরাতন ছবি।

* * *

তখন টিউশনি করিতাম।

উপর্যুপরি কয়েকবার বি.এ. ফেল করার দরুনই হউক অথবা শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎলাভের ফলেই হউক, ধর্মে মতি হইয়াছিল। স্বামী চিন্ময়ানন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতাম। বুঝিতাম, কর্মজগতে যাহাই হউক, ধর্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়! দিনের পর দিন স্বামীজি যে-সকল তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে শুনাইতেন, সেইগুলি এই গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রাসঙ্গিক, তাহাই শুনুন।

একদিন তিনি জন্মান্তর-রহস্য-প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিতেছিলেন, এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আমি শুনি নাই। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাকে ধরিলাম, জন্মান্তর রহস্য উদঘাটনের পন্থা বলিয়া দিতে হইবে।

প্রথমটা তিনি আপত্তি করিলেন।

শেষে তাঁহাকে বলিতেই হইল।

তাঁহার উপদেশানুসারে মুদ্রিতনেত্রে নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিলাম। জন্মান্তর-রহস্য-উদঘাটন করিতে হইবে।

* * *

ছাত্রের পড়া লইতেছিলাম।

সাধু শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কী হবে?

বলিতে পারিল না।

মুনি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে কী হবে?

পারিল না।

নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কী হবে?

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া একটা উত্তর দিল, ভুল উত্তর। ঠাশ করিয়া একটা চড় মারিয়া 'উপক্রমণিকা'খানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

... এইরূপ প্রত্যহ।

হঠাৎ বাসনা হইল ছোকরা পূর্বজন্মে কী ছিল একবার দেখিলে হয়। আমার বিশ্বাস, হয় গাধা, নাহয় গরু ছিল। স্বামীজির প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা তো খুবই সহজ।

সেদিন গভীর নিশীথে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদ্রিতনেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

এ কী, এ যে বিদ্যাসাগর!

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর!

স্বয়ং উপক্রমণিকার স্রষ্টা জন্মান্তর-রহস্যের ফেরে পড়িয়া 'নর' শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছেন না! আশ্চর্য ব্যাপার!

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আমার আর শাসন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি। অশ্রুজলে তাহার চরণ দুইখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা!

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম, শাসন করিতে পারি নাই, সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।

ফলে সে ফোর্থ ক্লাস হইতে কিছুতেই প্রমোশন পাইল না।

আমার চাকরিটি গেল। ভাগ্যক্রমে অন্যত্র একটা কেরানিগিরি জুটিয়া গেল, চলিয়া গেলাম।

বছর-পাঁচেক পরে আমার নূতন কর্মস্থলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সব কথা শুনিলাম। পড়াশোনা ছাড়িয়া দিয়া দিনকতক সে শখের থিয়েটারে মাতিয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্রে নাকি উত্তম অভিনয় করিত। মেডেল পাইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু সে লাইফ-ইন্সুরেন্সের এজেন্ট, আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কোম্পানিতে—

আমার চোখে জল আসিল।

সাধ্যাতীত হইলেও কিছু ইনশিওর করিলাম।

আবার আজ সে আসিয়াছিল।

চেহারাটা বেশ ভদ্র ভারিক্কিগোছের হইয়াছে। বলিল, ইন্সুরেন্সের দালালি করিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রাইভেট হোমিওপ্যাথি পড়িয়া সে ডাক্তার হইয়াছে এবং এই শহরে প্র্যাকটিস করিবে মনস্থ করিয়াছে। আমি যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

যথাসাধ্য করিব—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

নিষ্প্রয়োজনবোধে দুইটি খবর তাহাকে দিলাম না। খবর দুইটি এই—

(১) স্বামী চিন্ময়ানন্দ চৌর্যাপরাধে জেল খাটিতেছেন।
(২) আমি ক্রিশ্চান হইয়াছি।

অক্ষমের আত্মকথা

সে যেদিন আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল, সেদিনের কথা আমি ভুলি নাই। অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখখানি আমার বুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সে কী কান্না। কোনো কথা নয়, খালি কান্না। অন্ধকার ঘর। সূচিভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকার

গভীর রাত্রে সে আর আমি একা। আর কেহ নাই। তাহার অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্ধকার থমথম করিতেছে।

আমি নির্বাক।

* * *

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন অন্ধকার নয়, সেদিন জোছনায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যে-উন্মাদনা সে প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও ভাষা নাই। তাহার বুকের স্পন্দন আমি শুনিয়াছিলাম। উন্মত্ত সে স্পন্দন। তাহার স্পন্দিত বক্ষ আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলিয়াছিল, তাহা তাহাকে বলি নাই। বলিলেও সে বুঝিত না। বলিলেও কি লোকে সব কথা বোঝে? তাহা ছাড়া আমি বলিতেই পারিতাম কি?

* * *

আর একদিনের কথা।

সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। আমি পাশেই ছিলাম। নির্জন দ্বিপ্রহর। সে একখানা বই পড়িতেছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম তাহাকে। কী অপূর্ব তাহার দেহখানি, যেন প্রস্ফুটিত একটি শতদল! পরিপূর্ণ যৌবন-নদীর দেহের কূলে কূলে উদ্দাম হইয়াছে। বেশবাসের আবরণ তাহাকে আর যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওই তুচ্ছ শাড়িটা তাহার যৌবনস্পর্শ পাইয়া নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। টকটকে চওড়া লালপাড়টা মর্মান্তিক রকমের লাল। অন্যমনস্ক হইয়া সে হাতটা একবার আমার উপর রাখিল। আমার সমস্ত শরীরে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল, তাহা বুঝিল কি?

বুঝিল না।

আমারও বলিবার ভাষা ছিল না।

* * *

কোনোদিন তাহাকে কিছু বলি নাই। অথচ তাহার নিত্যসঙ্গী ছিলাম। তাহার সুখ, তাহার দুঃখ, তাহার উত্তেজনা, তাহার অবসাদ—সবই অনুভব করিতাম। সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। সে কিন্তু একদিনও, এক নিমিষের জন্যও আমার কথা ভাবিত না।

ভাবিত না—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভাববে কেন?

মানবী ছলনাময়ী।

অবশেষে সে আসিল।

যাহার আশায় তাহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাহার বিরহে তাহার নয়নপল্লবে অশ্রু নামিত, যে পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহদোলায় এতদিন দুলিতেছিল, সে একদিন সশরীরে বরবেশে আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে অধিকার করিল।

আমি কিছু বলিলাম না। আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেম-সম্মিলন নীরবে দেখিলাম।

পৃথিবীতে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমি দেখিতে কেমন জানি না। হয়তো খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ আছে, আমিও অনুভব করি। আমি দেখিতেই খারাপই তো! আমার সারা গায়ে ময়লা! যদিও

সপ্তাহ-অন্তর আমার বহিরাবরণ একবার করিয়া বদলানো হয়, তবু এ-কথা লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি, আমার অঙ্গ মলিন। তেল-চিটচিটে ময়লা। কেন? তাহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, আমি অক্ষম। কল্পনায় আমি বিলাসী, কিন্তু কী করিব, আসলে আমি যে বালিশ! ছোট তাকিয়া মাত্র। আমার কোনো হাত নাই। তাহার দুঃখে অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিয়াছে, সুরের স্পন্দনে সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, তাহার গোপন প্রেমলিপিকা সে নির্ভয়ে আমারই তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার অন্তরের সমস্ত নিগূঢ় বার্তাই আমি জানিতাম, তবু সে আমাকে হেলায় ত্যাগ করিল এবং বরণ করিল মানুষকে!

তাহার কতটুকু সে চেনে!

মানুষ

অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

গঙ্গাবক্ষে সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণনাতীত বর্ণসমারোহ। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্নসায়রে নিমগ্ন। শাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্তত উড্ডীয়মান মাছরাঙা পাখিগুলি সন্ধ্যারুণরাগ-রঞ্জিত। টলমল নদীজল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।

প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শোভা।

তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়।

দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধরদেহ একটি গাভী।

আরও একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার।

দেবালয়ে করুণ গম্ভীর সুরে নহবৎ বাজিতেছে।

পূরবীর অপরূপ আলাপ!

চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।

ভাবিতেছিলাম—কী সুন্দর এই পৃথিবী!

* * *

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

আমার পিছনে কে যেন জড়িতকণ্ঠে কথা কহিল।

ফিরিয়া দেখি, একটি ভিখারি এবং তাহার সহিত একটি মেয়ে।

ভিখারি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।

নাসিকার স্থানে একটি গহ্বর।

বিকৃত বীভৎস মুখখানায় মিনতি ফুটাইয়া অনুনাসিককণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে।

একটি পয়সা বাবু—

সঙ্গের মেয়েটিও সে-কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

মেয়েটির বয়স ষোল-সতের।

শরীরে কোনো ব্যাধি আছে বলিয়া মনে হইল না।

পরনে একটি মাত্র বসন—শতছিন্ন।

বসনের শত ছিদ্রপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।

দারিদ্র্যের মলিনতায় তাহা লাঞ্ছিত।

তবু তাহা যৌবনশ্রী।

মেয়েটিও সে সম্বন্ধে সচেতন।

তাহার মুখচোখ ভাবভঙ্গি ইঙ্গিতময়।

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিনি ইতিপূর্বে আরও দেখিয়াছি।

কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।

ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্যে।

ক্ষুধার অন্ন চাই।

ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।

সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে, আর একজন যৌবনকে।

দুইজনকেই দুইটি পয়সা দিলাম।

চলিয়া গেল।

কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে।

মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছুদূরে গিয়া সে আর-একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।

মুখে মুচকি হাসি।

নির্বাক হইয়া রহিলাম।

তাহার ছিন্ন বসনে শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

* * *

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

সচকিত হইয়া দেখিলাম—বিড়ালটা একটা ইঁদুর ধরিয়াছে।

ওঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিল।

গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম, দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।

তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।

* * *

আকাশে কৃষ্ণপক্ষ মেলিয়া সারি-সারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পালতোলা নৌকাগুলি দেখিলাম, জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া দেখিলাম।

আলোকসমারোহ আর নাই।

অস্তমিত রবির বর্ণসমারোহ চক্রবালরেখায় ম্রিয়মাণ।

অন্ধকার নামিতেছে।

উঠিয়া পড়িলাম।

পথে দেখিলাম, সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিনি একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাস্য-পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বাড়ি ফিরিয়া শুনিলাম, পাশের বাড়ির বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আনন্দশঙ্খধ্বনি সে শুভবার্তা ঘোষণা করিতেছে। সদ্য পুত্রশোকাতুরা আমার গৃহিণী সজলচক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন, ভগবান বাঁচাইয়া রাখো।

অন্যমনস্কভাবে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজগুলা উল্টাইতে লাগিলাম।

বহু বাধাসত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আর-একদল দুঃসাহসী এভারেস্ট অভিযানে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

চীন-জাপান যুদ্ধ।

স্পেন।

বাঙালির দুর্গতি ও তাহার নানা প্রকাশ।

কংগ্রেস।

দুয়ারে কড়া নাড়িয়া উঠিল।

পিওন তার আনিয়াছে। সুসংবাদ। আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকরি হইয়াছে। এই চাকরিটির জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাইই চাকরিটি পাইয়াছে।

এতবড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না।

উপরন্তু খুশি হইলাম।

ছাদে উঠিলাম।

কালো মেঘের স্তর ভেদ করিয়া অপরূপ শোভায় চাঁদ উঠিয়াছে।

পূর্ব দিগন্ত জোছনা পুলকিত।

মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার জন্য একটি সিগারেট ধরানো প্রয়োজন।

পকেটে হাত দিয়া দেখি, সিগারেট-কেস খালি।

সিগারেট আনিতে ভুলিয়াছি।

আবার মনটা বিগড়াইয়া গেল।

উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

এক

স্তব্ধ হইয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মতো পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কী বলিব—কথা সরিতেছে না।

*　　*　　*

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশি করিয়া মেশে নাই।

স্কুলের পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিঙে আর তকু থাকিত বাড়িতে। এক পল্লিগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভরতি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভরতি হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওই তকুকে যেমন করে হোক হটাতে হবে। পারবে তো?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তকু কী বস্তু।

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন, 'ওই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে ভালো ছেলে, কিন্তু হাজার ভালো হলেও পাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরেজিতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না।'

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ। তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই। সেইজন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল।

তকু ছিল কবি। সে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ-করা ভালো ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্স্ট হওয়ার গৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্স্ট বয় আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের একজন উদীয়মান কবি। তফাৎটা যে কী এবং অত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে, তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

দুই

ক্রমশ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহকোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর-একজন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। 'অসাধারণ রূপ' বলিতেছি কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমন সুন্দরী সত্যিই আমি দেখি

নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোখ মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ব। চাঁপাফুলে গোলাপ-আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর দশেকের মেয়ে—অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া! আমার সহিত কথা বলিল না! আচারে, ব্যবহারে, ভাবে, ভঙ্গিতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল সে আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কী-ই বা ছিল। সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

*　　　*　　　*

তকুর বাড়ি প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারই। সুতরাং ক্রমশ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে, প্রথমদিনই সে আমাকে বলিয়াছিল, 'দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফার্স্ট বয়?'

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, 'হ্যাঁ—'

উত্তরে সে কী বলিল শুনিবেন?

'বই মুখস্থ করে ফার্স্ট সবাই হতে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি?'

মনে পড়িতেছে, একটু সলজ্জ গলায় খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম, 'আমি তোমার দাদার মতো নই তো। হতেও চাই নি—'

'পারবেনই না।'

দশ বছরের মেয়ে!

তিন

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসর ত্রৈলোক্যের বাড়ি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম, দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—নাহয় শাড়িটি গুছাইয়া পরিতেছে—নাহয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—নাহয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালোবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ীর মুখপানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল, মাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সে সদ্যজাগ্রত যৌবনে—বেশি বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা যা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে আমার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে! আশ্চর্য প্রেমের নিয়ম! আমি ঠিক তাহাদের

পালটি ঘর ছিলাম, আমার ভালো ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত, বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে, তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতি দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, 'আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু বলবেন না। নিজের চেহারাটা কখনো দেখেছেন আয়নায়?'

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।...সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা-একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অতবড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব করিবার মতো রূপ আছে, সে তাহা লইয়া গর্ব করিবে বইকি! রূপসী মাত্রেই গরবিনি। গর্বটা সৌন্দর্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কী যুক্তি।

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশুনোয় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—, তারপর পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

চার

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গেল—বাবা, মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সেই সাহিত্যসাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করিতে পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই-না সহজ ছিল! তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না, আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে, মালতীর জন্য একটি ভালো পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, 'ভালো পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানা একটি ভালো পাত্র আছে, কিন্তু চেহারা সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল তো সম্বন্ধ করি।'

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোনো উত্তর আসে নাই।

পাঁচ

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম. এ. পড়িতেছি। আশ্চর্য মানুষের মন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া

বসিয়াছে আর একজন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস মিত্র। আমার সহপাঠিনী ... আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরিতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিস মিত্র আমার সমীপবর্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণত যেভাবে ঘনিষ্ঠতর হয় সেইভাবে হইয়াছিল। মিস মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখেমুখে একটা মার্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিলাম যে মনে রং ধরিয়া গেল। ... ক্রমশ চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলাফেরা লক্ষ করিতেছি, কোন কোন রঙের শাড়ি পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি।

ছয়

যখন মিস মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে, আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ হইবে, এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

বলিলাম, 'সে কী সম্ভব?'

তকু বলিল, 'সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল্? অসাবধানে স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে—ছি, ছি, কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। মা বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতে সাহস পাই না যে!' বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, 'না ভাই, এখন আর সে হয় না। অনেকদূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—'

মানপুর গেলাম।

* * *

পায়ের উপরে উপুড় হইয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি, 'কক্ষনো তুমি আমায় ভালোবাস না, কক্ষনো না। একদিনও বাস নি, বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ—কেন—কেন—কেন—'

পাগলের মতো বলিয়া চলিয়াছে।

'শোন, একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—'

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে, তাহার এ মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া, কদাকার। অসাবধানে স্টোভ জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

থিওরি অব রিলেটিভিটি

এক

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলাম। আমার ধার আছে, গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরানিগিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব করিয়া বেড়াই। কলেজে আমার অপেক্ষা যেসব সহপাঠী নিম্নস্তরে ছিল, কর্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বির জোরে উঠিয়া গিয়াছে—এইপ্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমার সর্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ এই বুড়িটা। এই বুড়ি তাহার শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই বুড়িটা না সরিলে...আহ্! কী মুশকিল।

পীড়িতা মাসিমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থর-গতি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এই জাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে অমলিন পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন—'রাস্তাটা থেকে সরে দাঁড়ান একটু। বাথরুমে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া করে।'

যথাসাধ্য দেহ-সঙ্কোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক 'বাথরুম' হইতে প্রত্যাগমনের মুখে বলিলেন—'এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ওধারে চলুন না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'ওদিকে কি জায়গা আছে?'

'আহা, চলুনই না—'

বুড়ির সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—'বসুন, আমার এই তোরঙ্গটার উপরেই বসুন। আসল 'স্টিল'—আপনার মতো দশজন বসলেও কিছু হবে না!' তোরঙ্গটার চেহারা ভালোই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না। বস্তুত আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন—'আমার জিনিস ভালো না দিলে নিস্তার আছে ছগ্‌গনলালের। তার মনিব হল গিয়ে আমার মুঠোর মধ্যে।'

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়াছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—'তাই নাকি?'

'তাই নাকি মানে? ছগ্‌গনলালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিস দেয়? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হল গিয়ে আমার খাতক।'

ভদ্রলোককে খুশি করিবার জন্য আমি আবার বলিলাম—'হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।

ভ্রূযুগ ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি।'

নিরীহভাবে বললাম—'টাকা কুড়ির তো কম নয়ই। কত?'

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—'আপনার দোষ নেই, হয়তো আসল দাম ওইরকমই হবে। আমি গণ্ডা বারো পয়সা দিয়েছিলাম।'

সত্যই অবাক হইয়া গেলাম।

'বলেন কী! বারো আনা?'

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—'তাও নিতে চায় না। ছগ্গনকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা টাকা দিলাম, তার থেকেও চার গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে।'

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগ্গনলালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—'যদিও আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না'—বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চির নিচ হইতে একজোড়া ব্রাউন রঙের ভালো ডার্বি 'সু' বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—'এর দাম কত হবে বলুন তো?'

'পাঁচ-ছ টাকা তো মনে হয়।' ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

'রায় মশায় কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশি নিলেন না। কারণও অবশ্য আছে। রায় মশায়ের ছেলের চাকরিটা এককথায় করে দিলাম কিনা। টমসন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।'

চকিতে বুঝিলাম এই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক সামান্য ব্যক্তি নহেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ির বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ির অপর প্রান্তে দেখিলাম, বুড়িটা বেঞ্চিটার উপর জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়িটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দুই

'ওটা কী পড়ছেন?'

'ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।'

ভদ্রলোক কোণে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছিলাম।

'ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুসকি দিয়ে বলিলেন—'কার লেখা?'

'পান্নালাল চক্রবর্তীর।'

'মেয়েটি লেখে ভালোই, কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—'

'পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ নাকি?'

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—'মেয়েমানুষ শুধু নয়, একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী।'

আমি সত্যিই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যুতের মতো একটা পুলকিত শিহরণ সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা আমার ভালো লাগে। শুধু ভালো

লাগে বলিলেই পর্যাপ্ত হয় না, তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা দেখতে পাই সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ। তন্বী—গৌরী—যুবতী!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—'টুনি তো এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্যন্ত ফ্রক পরে, বেণি দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বেশ চালাক-চতুর। এককথায় ওরকম মেয়ে আমি এদেশে বড় একটা দেখিনি—'

বলাবাহুল্য কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—'কীরকম?'

'ওর মতো ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম, স্বাধীন দেশে জন্মালে ও-মেয়ে একটা রিজিয়া বা এলিজাবেথ হত। অন্ততপক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা-স্টার। ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্য অস্থির হল—'

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভূষণ কে?'

'ভূষণ হল গিয়ে টুনির বাপ! বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে! বিয়ের পর ও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন!'

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন।

মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—'টুনি—পান্নালাল চক্রবর্তী—হেঁ!'

একটা স্টেশনে ট্রেন থামিল।

আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়াছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চিটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাঁহার মুখ দেখা গেল না। অনুমান করিলাম, কোনো মাড়োয়ারী হইবেন।

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারংবার একটি কথাই মনে হইতেছে—পান্নালাল চক্রবর্তী, তন্বী—গৌরী—যুবতী!

তিন

ধপাশ করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয়—বাঙালিই। খোঁচা-খোঁচা গোঁফঅলা স্থূলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন! সামলাইয়া লইয়া একজোড়া বড় বড় সদ্য-ঘুমভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম, তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'স্টেটসম্যান' লইয়া 'ওয়ান্টেড' পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেন আসিয়া ব্যান্ডেল স্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া ভাঁড়ে খানিকটা চা জোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা-খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা আর-একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাতলা-ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে, একি পান্নালাল যে! কোথা যাচ্ছেন?'

খোঁচা গোঁফের মালিক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—'কোন্নগর।'

'দেখা হয়ে গেছে যখন, তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ওবেলা যাবেন। এবেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্যচর্চা করা হয়নি। এ মাসের 'কাহিনী-কুঙ্কুম' কাগজে আপনার 'চলতি চাকা' পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা!'

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?

কিন্তু না, থার্ড ক্লাস গাড়িতে উবু হইয়া বসিয়া একভাঁড় বিশ্রী চা-হস্তে স্বপ্ন দেখাও তো সম্ভব নয়। 'চলতি চাকা' গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং 'কাহিনী-কুঙ্কুম' এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শুনিলাম, ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—'আপনিই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী?'

ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্বে বলিলেন—'হ্যাঁ, ইনিই।'

ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—'নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হল। এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তাহলে? আচ্ছা, নমস্কার।'

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন। ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্রাঙ্কের মালিকের দিকে রুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম।

সংক্ষেপেই বলিলাম—'এটা কীরকম হল?'

'কোন্‌টা?'

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করিলেন।

'বাহ্! কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন পান্নালাল চক্রবর্তী একজন মেয়েমানুষ। তাকে আপনি চেনেন, অথচ—'

নির্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—'আর কী কী বলেছিলাম?'

'আর বলেছিলেন আপনার ওই ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা—'

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন, 'যিনি বলেছিলেন তিনি চলে গেছেন। আমি অন্য লোক।'

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

'অন্য লোক মানে!'

'অর্থাৎ আমার 'অ্যাংগল অব ভিশন'—মানে কিনা দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্য প্রকার।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না—'

সহসা ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

একমুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন—'পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বলুন! কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল, হয়তো পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ—ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়ছে এই ট্রাঙ্ক ও জুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তের ও পৌনে সাত টাকা দিয়াছিলাম। 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'—বুঝলেন না?'

বুঝিলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ গাড়ির অপর প্রান্ত হইতে শুনিলাম—

'আরে বাবুরা তু কাঁহা...'

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়িটা আমাকে ডাকিতেছে।

রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই, এখন চিনিলাম, মাসিমার বাড়ির পুরাতন দাই রুকমিনিয়া। মাসিমারা যখন বেহারে ছিলেন তখন হইতে রুকমিনিয়া মাসিমার বাড়িতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসিমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ির কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ি 'মহাবীরজি'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসিমা যাহাতে ভালো হইয়া যান। মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজির পরসাদ বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম।

'থিওরি অব রিলেটিভিটি'ই বটে!

পাঠকের মৃত্যু

এক

প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা।

আসানসোল স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। ঠিক আমার পাশেই আর-একজন বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বই ছিল। বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। আলাপ-পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে ভদ্রলোককে ট্রেনের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমার ট্রেনের সময় ঘণ্টা-তিনেক দেরি ছিল।

আমরা উভয়েই বাঙালি।

সুতরাং পাঁচ মিনিট পরেই তাঁহাকে যে-প্রশ্নটি আমি করিলাম তাহা এই—'আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন না—'

এই উত্তরই স্বাভাবিক এবং আশাও করিলাম।

অবিলম্বে বইখানা দখল করিয়া বসিলাম।

দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহর।

আসানসোল স্টেশনের টিনের ছাদ।

সমস্ত কিছু তলাইয়া গেল।

উপন্যাস অদ্ভুত।

বহির মালিক ভদ্রলোক আড়-নয়নে একবার আমার পানে চাহিয়া একটু ভুরু কুঞ্চিত করিলেন এবং একটি টাইম-টেবল বাহির করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া চলিলাম।

* * *

চমৎকার বই।

বস্তুত এমন ভালো উপন্যাস আমি ইতিপূর্বে পড়ি নাই।

একেবারে যেন জুতাইয়া দিতেছে।

* * *

দুই ঘণ্টা কাটিল।

বহির মালিক ভদ্রলোক টাইম-টেবলটি বারংবার উল্টাইয়া অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'আপনার ট্রেনের তো আর বেশি দেরি নেই। এইবার—'

বলিয়া একটু গলা খাঁকারি দিলেন।

আমি তখন তন্ময়।

চকিতে একবার হাতঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্ধেকের উপর বাকি। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

অদ্ভুত বই।

বাকি ঘণ্টাটা যেন উড়িয়া গেল।

আমার ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

বই-এর তখনও অনেক বাকি।

রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।

বলিলাম—'নেকস্ট ট্রেনে যাব—এ বই শেষ না করে উঠছি না!'

বহির মালিক ভদ্রলোক একটু একটু কাশিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ট্রেন চলিয়া গেল—বই পড়িতে লাগিলাম।

শেষ কিন্তু করিতে পারি নাই।

শেষের দিকে অনেকগুলি পাতা ছিল না।

বহির মালিককে বলিলাম—'এহ্, শেষের দিকে এতগুলো পাতা নেই। আগে বলেন নি কেন? ছি ছি—'

এতদুত্তরে ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

দুই

দশ বৎসর পর উক্ত পুস্তকখানি আর-একবার আমার হস্তগত হইয়াছিল।

আমার ভাগিনেয়ীর শ্বশুরালয়ে।

তাহাকে পৌঁছাইতে গিয়াছিলাম। সেইদিনই ফিরিয়া আসার কথা। কিন্তু বইখানির লোভে থাকিয়া গেলাম।

সুযোগমতো বইখানি সংগ্রহ করিয়া আবার সাগ্রহে পড়া শুরু করা গেল। খাপছাড়াভাবে শেষটুকু না পড়িয়া গোড়া হইতেই আবার জমাইয়া পড়িব ঠিক করিলাম।

কয়েক পাতা পড়িয়াই কেমন যেন খটকা লাগিল।

উল্টাইয়া দেখিলাম—হ্যাঁ, সেই বই-ই তো!

আবার কয়েক পাতা অগ্রসর হইলাম—নাহ্, কেমন যেন গোলমাল ঠেকিতেছে।

তবু পড়িতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল—নাহ্, আর তো চলে না।

এ কি সেই বই যাহা আমি আসানসোল স্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে ঊর্ধ্বশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম?

এমন রাবিশ মানুষে লেখে!

এ শেষ করা তো অসম্ভব!

দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়াছিল টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।

দামোদর

কয়েক দিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় কাটিয়াছে।

এখন শঙ্কা অপনোদিত হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা দার্শনিক চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে। ঘটিয়া যাইবার পর অধিকাংশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারই দার্শনিকতার খোরাক যোগাইয়া থাকে, সেদিন যেমন ঘটিল। নিতাইবাবু ধার-কর্জ করিয়া অনেক কষ্টে ছেলেটিকে মানুষ করিতেছিলেন। ছেলেটিও ভালো—যেমন দেখিতে, তেমনই পড়াশোনায়। বলা নাই, কহা নাই, অকস্মাৎ ছেলেটির হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া গেল এবং ছেলেটি মারা গেল। আমরা ইহা লইয়া সকলেই পরিতাপ করিতেছিলাম, এমন সময় নিতাইবাবু নিজেই আসিয়া আমাদের প্রবোধ দিলেন। বলিলেন যে, ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা; করুণাময় ভগবান একে একে তাঁহার বন্ধনগুলি মোচন করিতেছেন; ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে কেন? গত বৎসর স্ত্রী গিয়াছে, এ বৎসর ছেলেটি গেল। বাকি আছে ছোট একটা মেয়ে; কিন্তু তাহারও শরীরের যা অবস্থা—প্রত্যহই জ্বর হইতেছে, সুতরাং হয়তো শীঘ্রই তাঁহাকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হইতে হইবে।

এই বলিয়া নিতাইবাবু একটু হাসিলেন। যদিও তাঁহার এই মলিন হাসিটুকু ক্রন্দন অপেক্ষাও অধিক মর্মান্তিক, তথাপি ইহা বেশ প্রতীয়মান হইল যে, একটা দার্শনিক প্রশান্তি আসিয়া তাঁহার শোককে স্নিগ্ধ করিয়াছে। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, দার্শনিক চিন্তা শুধু-যে আমাদের জীবনে অনিবার্য তাহা নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। সংসারটাকে যদি মরুভূমির সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দার্শনিক চিন্তাগুলিকে 'ওয়েসিস' বলিতে হয়। কারণ দেখিতেছি, এই সংসারে উহাদেরই আশ্রয়ে খানিকটা শান্তিলাভ করা সম্ভব। এই মরুভূমিতে উহাদেরই উদ্দেশে মানুষ, উট—সকলেই ছুটিতেছে। জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনারই একটা-না-একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা খাড়া না করিলে আমাদের যেন নিদ্রাই হয় না।

এইবার যে-কথাটা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

আসল কথাটা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু অবান্তর কথা প্রসঙ্গে আর একটি অবান্তর কথা লেখনীমুখে আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা এই যে, শাখা-প্রশাখা না থাকিলে বৃক্ষ নদী (বা সম্মিলন) যেমন সার্থকতা লাভ করে না, প্রসঙ্গগত কয়েকটি অবান্তর কথার উল্লেখ না করিলেও তেমনিই কোনো প্রসঙ্গই জমে না। প্রজাবৃদ্ধি ব্যাপারে ঢাক ঢোল শানাই পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র (অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানটাই) অবান্তর এবং বিবাহ ব্যাপারেও বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর দল নিরর্থক। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই যে, প্রজা-বৃদ্ধিমানসে সে ঢাক ঢোল শানাই বাজাইয়া বিবাহ করিবে, এবং বিবাহ করিতে গিয়া একদল বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী জুটাইবে; অবান্তর হইলেও এসব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

আর নয়, এইবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

কয়েক দিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। এই জাতীয় শঙ্কা বাল্যকালের পরীক্ষার পূর্বে অনুভব করিতাম। মনে হইত, কাল প্রশ্নপত্রে কী বিভীষিকাই না জানি দেখিব! পরীক্ষাসাগরে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়া তরী বহুকাল পূর্বে তীরে ভিড়াইয়াছি, পরীক্ষিত বিষয়গুলির একটি বর্ণও এখন আর মনে নাই; কিন্তু পরীক্ষাটা যে সত্য সত্যই পরীক্ষা ছিল তাহা এখনও মনে রীতিমতো জাগরূক আছে। সে ভীতি বিস্মৃতির তলায় এখনও তলাইয়া যায় নাই। সেদিনও তৎসম ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, যখন ডাকযোগে একখানি পত্র আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিয়া গেল যে, দামোদরবাবু আসিতেছেন।

সর্বনাশ!

দামোদরবাবু লোকটি আমার অদৃষ্টপূর্ব হইলেও অশ্রুতপূর্ব নহেন। ইঁহার বিষয় অনেক কিছুই শুনিয়াছি এবং শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিয়াছি। পরের কথা বিশ্বাস করিতে অথবা পরের সম্বন্ধে চর্চা করিতে কোনো অর্থ ব্যয় হয় না বলিয়াই বোধহয় আমরা তাহা এত সহজে করি। ভাগ্যে হয় না! হইলে তো মারা গিয়াছিলাম।

দামোদরবাবু-প্রসঙ্গে মন্দ অবশ্য কিছু শুনি নাই। পরন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহা এত বেশি রকম ভালো যে, সেই কারণেই ভয় ধরিয়া গেল।

জনশ্রুতি, দামোদরবাবু অতি উচ্চস্তরের প্রাণী। ঘোর মর‍্যালিস্ট, তাঁহার নিজস্ব একটা নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী তিনি জীবনধারণ করেন। পুলিশে চাকরি করেন, কিন্তু কখনও ঘুস গ্রহণ করেন নাই; মিথ্যা কথা বলেন না। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। মস্তকে টাক টিকি দুই-ই আছে। অর্থাৎ এইরূপ চরিত্রবান উন্নতমস্তক নিষ্কলঙ্ক লোক বর্তমান যুগে দুর্লভ।

এহেন দামোদরবাবু আমার অতিথি হইবেন শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দামোদরবাবু না আসিয়া সুন্দরবনের কোনো ব্যাঘ্র যদি আমার অতিথি হইতে আসিতেন, তাহা হইলেও বোধহয় এতটা ভীত হইতাম না। নিখুঁত-চরিত্র দামোদরবাবুকে লইয়া আমি যে কী করিব ভাবিয়া পাইলাম না। অপরাধের মধ্যে আমি তাঁহার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সম্পর্কেও আবার গুরুজনস্থানীয়—আমার স্বর্গীয়া বৈমাত্রেয় ভগিনীর মামা-শ্বশুর তিনি। আমার সহিত তাঁহার গোপনীয় কী সব কথাবার্তা নাকি আছে যাহা পত্রযোগে হওয়া

অবাঞ্ছনীয়; সুতরাং তিনি সশরীরে আসাই স্থির করিয়াছেন। এইরূপ সর্বগুণান্বিত আত্মীয়কে অতিথিরূপে লাভ করা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করা উচিত। কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি মনে মনে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রামা, শ্যামা, হরি, যদু নহে—স্বয়ং দামোদরবাবু। কিভাবে তাঁহার সহিত চলিব, কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলিব, কোন কথায় হাসিব, কোন কথায় গম্ভীর হইয়া থাকিব, কিসে সায় দিব, কিসে আপত্তি করিব—ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনো কূলকিনারা করিতে পারিলাম না।

মনে মনে অনর্গল ঘামিতে লাগিলাম।

বাল্যকালের পরীক্ষার পূর্ববর্তী দিনগুলি যেন ফিরিয়া আসিল।

নির্ধারিত দিবসটিতে পরীক্ষা যেমন অনিবার্যভাবে শুরু হইয়া যায়, দামোদরবাবুও তেমনই আসিয়া পড়িলেন।

আমার পুত্র তাঁহার সংবর্ধনাকল্পে স্টেশনে গিয়াছিল।

আমি গৃহকোণে কৃতসংকল্প হইয়া বসিয়াছিলাম যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত কোনো প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত যদি আলোচনা করিতেই হয়, ধর্ম-প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিব। সম্প্রতি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' খানা পড়িয়াছি।

সুতরাং খানিকক্ষণ বেশ চালাইতে পারি।

অন্তঃপুরে শুদ্ধাচার-নিষ্ঠাচারের দিকে কড়া নজর রাখিবার জন্য গৃহিণী তাঁহার গেঁটে-বাতকে উপেক্ষা করিয়া চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। সুতরাং সেদিকে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।

আমার আচরণে কোনো অসঙ্গতি না প্রকাশ পায়, এই ভয়েই আমি মনে মনে তটস্থ হইয়া বসিয়া ছিলাম।

স্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া গেটে থামিল।

কৃষ্ণকায়, বেঁটে, মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে এক ব্যক্তি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন দেখিলাম। টাক ও টিকি রহিয়াছে ; সুতরাং উনিই নিঃসন্দেহে দামোদরবাবু। ভদ্রলোকের রক্তাভ চক্ষু দুইটি এত বড় যে, মনে হয় যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মুখখানি গোলাকার, রোমহীন। কাঁচাপাকা একজোড়া পুষ্ট ভুরু আছে। গলাবন্ধ জিনের কোট পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। কণ্ঠলগ্ন তুলসীর মালাটিও দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সম্বন্ধে এতকাল যাহা শুনিয়াছি তাহার সমলকত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোনো কারণ নাই।

তিনি নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার প্যানেলা জুতা হইতে কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া শিরোধার্য করিয়া ফেলিলাম।

গুরুজন!

বয়সে কিন্তু আমার অপেক্ষা প্রবীণতর বলিয়া তাঁহাকে মনে হইল না। দামোদরবাবু সস্মিত মুখে বলিলেন, থাক্ থাক্, বড় আনন্দিত হলাম বাবা, তোমাদের সব দেখে। বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও সব। নিজেদের লোক, অথচ চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কার্যকারণের যোগাযোগ না ঘটলে হয়তো দেখাই হ'ত না। ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।

অনুমতি পাইয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

দামোদরবাবুও বসিলেন।

দুই-চারি কথার পর তিনি বলিলেন, আমায় নিরিবিলি দেখে একটা ঘর দিতে হবে বাবা, বাইরের দিকে হলেই ভালো হয়, পুজো-আচ্চা সাধন-ভজন নিয়ে থাকি আমি—

সৌভাগ্যক্রমে বাহিরের দিকে একটি ঘর খালি ছিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি নিজের জিনিসপত্রসহ সেই ঘরেই গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমি সম্ভ্রমসহকারে সমস্ত দিনটা দূরে দূরেই কাটাইলাম।

ভদ্রতা রক্ষার নিমিত্ত একবার তাঁহার ঘরটিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দামোদরবাবু বলিলেন (এবং তাঁহার ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুইটি দেখিয়া বুঝিলাম), ট্রেনে সমস্ত রাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। চারটি খেয়ে ঘুমুতে হবে, স্নানটা সেরে ফেলা যাক ; সন্ধ্যাবেলা সব কথা হবে।

স্নানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

শুনিলাম, স্নানান্তে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আহ্নিকাদি করিয়াছেন। এই বার্তায় গৃহিণী গদগদ হইয়া গঙ্গাজলে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি পাক করাইলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া শ্বেত পাথরের থালা বাটি গ্লাস বাহির করিয়া গঙ্গোদকে সেগুলিকে পরিমার্জিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, আমাদের ম্লেচ্ছস্পর্শদুষ্ট তৈজসপত্রে দামোদরবাবুর মতো নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণকে খাইতে দিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও সে কথার সমর্থন করিলাম।

গৃহিণীর ধর্মানুমোদিত ব্যবস্থায় ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে আহারাদিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দামোদরবাবু আতপ-তণ্ডুল, গব্য-ঘৃত এবং নিরামিষ আহার করিয়া হরীতকী চিবাইতে চিবাইতে নির্দিষ্ট বাহিরের ঘরটিতে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত দিন আপন মহিমা লইয়া উক্ত ঘরটিতেই নিবদ্ধ রহিলেন।

অর্থাৎ দিনটা একরূপে ভালয় ভালয় কাটিল।

সন্ধ্যা হইল।

পৌত্রের নিকট খবর পাইলাম, দামোদরবাবু নাকি মহাসমারোহে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। ভৃত্য ভূতনাথ জলখাবার লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পূজারত দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দারুণ ব্যাপার!

আর একটু পরে খবর লইয়া জানিলাম, তিনি সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়াছেন। কী কথা বলিবার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কোনো আভাস তো এখনও পাইলাম না। ভাবিলাম, যাই, নিজেই একবার খোঁজখবরটা লইয়া আসি।

গিয়া দেখিলাম, কপাট বন্ধ।

অত্যন্ত সমীহভরে একবার গলা-খাঁকারি দিলাম।

কোনও শব্দ নাই।

দ্বার অর্গলবদ্ধ নাকি?

ঠেলিয়া দেখিতে গিয়া কপাটটা খুলিয়া গেল এবং চোখে পড়িল, তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া মুছিয়া দামোদরবাবু কাচের গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিতেছেন। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি সস্মিত মুখে সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, এস, দাদা, এস।

এরূপ সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বোধনে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সকালে 'বাবা' ছিলাম, সন্ধ্যাবেলায় কী করিয়া 'দাদা' হইয়া গেলাম—চিন্তা করিতে গিয়া নিকটেই টুলের উপর ছোট বোতলটি নজরে পড়িল এবং অচিরাৎ চিন্তামুক্ত হইলাম।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল যেন।

আরও আনন্দিত হইলাম এই দেখিয়া যে, তিনি সেই সনাতন অজুহাতটির দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ডাক্তারের প্রেস্‌কৃপশন অনুসারেই খেতে হচ্ছে ভায়া এই অখাদ্যগুলো। উপায় কী।

সত্যই উপায় নাই। আমরাও এককালে বলিতাম। ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, যাক্‌, স্ব-গোত্রই তাহা হইলে এবং প্রকৃতই আত্মীয়।

অনর্থক এতক্ষণ ঘামিয়া মরিতেছিলাম!

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরাদস্তুর জমিয়া উঠিল।

এমনকি, গোপনে তাঁহার জন্য পেঁয়াজি-বড়া, কাটলেট প্রভৃতিও আনাইয়া দিতে হইল, এবং বহুকাল পরে দুই-চারি ঢোক পান করিয়া আমিও বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ডাক্তারি ব্যবস্থার গুণে দামোদরবাবু অন্তরের সমস্ত দ্বারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন।

দেখিলাম, হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। আমার সহিত দামোদরবাবুর কোনো তফাতই নাই।

অকস্মাৎ দামোদরবাবু আমার হাত দুইটি ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন যে, ঋণে তাঁহার মাথার চুল পর্যন্ত বিকাইয়া গিয়াছে এবং এখনও বিবাহযোগ্যা দুইটি অনূঢ়া কন্যা তাঁহার মাথার উপর খড়্গের মতো ঝুলিতেছে। আমার নিকট তিনি আসিয়াছেন কিছু অর্থসাহায্যের জন্য। যদি আমি দয়া করিয়া—

আর তিনি বলিতে পারিলেন না।

আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কাল দামোদরবাবু চলিয়া গিয়াছেন।

অত্যন্ত বেদনাভরে তাঁহার কথা একান্তে বসিয়া স্মরণ করিতেছি। দামোদরবাবু যদি কোনো যুবতী হইতেন, তাহা হইলে মর্মদর্শী কবিগণ হয়তো আমার এ বেদনাকে বিরহবেদনা নামে অভিহিত করিতেন। সত্যই দামোদরবাবুর বিরহে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি। সত্যই তাঁহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া মনকে প্রশ্ন করিতেছি, কেন?

যতক্ষণ তাঁহাকে নির্মলচরিত্র নিষ্ঠাবান নিখুঁত ব্যক্তি বলিয়া জানিয়াছিলাম ততক্ষণ সভয়ে তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতেছিলাম; কিন্তু যেই তাঁহাকে নেশাখোর ও দেনাগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারিলাম, অমনই তাঁহাকে ভালো লাগিয়া গেল। আশ্চর্য তো! নৈতিক আদর্শের দিক হইতে এরূপ মনোবৃত্তি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে।

মন উত্তর দিতেছে—কিন্তু ইহাই সনাতন মনোবৃত্তি। আমরা মহৎকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালোবাসি তাহাকেই যাহার শত দোষ সম্বন্ধে আমরা সচেতন। যে কারণে স্ত্রীকে, পুত্রকে এবং নিজেকেও বহু-দোষ সত্ত্বেও ভালবাসি, ঠিক সেই একই কারণে দামোদরকেও ভালোবাসিয়াছি। দোষ আছে বলিয়াই দামোদরের সহিত নিজের একত্ব ও আত্মীয়তা এত সত্যভাবে অনুভব করিতেছি। একই আমরা! নানা দোষে দুষ্ট—নির্মম প্রকৃতির তাড়নায়

অসহায়—দুর্বার জীবনস্রোতে বিপর্যস্ত। উভয়েই অসহায় বলিয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই। বিগত ভূমিকম্পের সময়ে ধনী–নির্ধন, উচ্চ–নীচ, সভ্য–অসভ্য, অত্যন্ত অসহায়ভাবে কয়েক দিনের জন্য নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া যে–কারণে একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত আমি, মদ্যপায়ী নেশাগ্রস্ত দামোদরের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। এখন তাহার সত্যমূর্তি দেখিতে পাইয়াছি। মিথ্যা জনশ্রুতির কুজ্ঝটিকা যেন চিরপরিচিত বটগাছটাকে কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যে পরিণত করিয়াছিল। কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে, বটগাছটার সনাতন রূপ দর্শন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। দামোদর এতদিন নামেই আত্মীয় ছিল, এইবার সত্য সত্যই তাহার আত্মার আভাস পাইয়াছি।

মনের যুক্তির উত্তরে কী বলিব মাথায় আসিল না।

এখন ভাবিতেছি, দামোদরকে কী উপায়ে কিছু অর্থসাহায্য করা যায়। তাহাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া বিদায় করিয়াছি। ভাগ্য ব্যাংক বন্ধ, ছুটি ছিল। তাহাকে বলিয়াছি যে, ব্যাংক খুলিলেই টাকা বাহির করিয়া কিছু তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

হায়, দামোদর আমার ব্যাংক–ব্যালান্সের খবর যদি রাখিত। অকপটে তাহার নিকট স্বীকার করিলেই চুকিয়া যাইত। কিন্তু কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল—পারিলাম না। আহা, বেচারি এত আশা করিয়া আসিয়াছে। ধার করিয়াও দিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রেস্‌টিজ। প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া দেখিতেছি উপায় নাই। সে সম্প্রতি প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে পারে। কিন্তু সরল সত্য কথাটি বলিলে সে এক পয়সাও দিবে না। তাহাকে তো চিনি।

কী জাতীয় মিথ্যা গল্প রচনা করিলে প্রাণকান্তের মন বিগলিত করিতে পারিব—ব্যাকুল অন্তরে তাহাই চিন্তা করিতেছি। দামোদরের অশ্রুভারাক্রান্ত ড্যাবডেবে চোখ দুইটা বারম্বার মনে পড়িতেছে।

বিবেক

এক

দেখিতেছি এবং শুনিতেছি। চক্ষু কর্ণ এখনও বিকল হয় নাই। সুতরাং অনেক রকম দেখিতে ও শুনিতে হইতেছে। এই সকল দর্শন–শ্রবণের ফলে যাহা ঘটিতেছে, তাহাকে অঘটন আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। অঘটন ঘটিতেছে, কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ নহে, রসনা এবং দক্ষিণ হস্তখানিও এখনও সক্রিয় আছে। কিন্তু রসনা ও দক্ষিণ হস্তের উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ রসনা এবং হস্ত নহে, বিবেক নামক বস্তুটিও এখনও রীতিমতো জাগ্রত রহিয়াছে। মুশকিলে পড়িয়াছি।

সেদিন চক্ষু বলিল, দেখ দেখ, রামের গাছ হইতে শ্যাম জোর করিয়া আম পাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িতেছে।

কর্ণ বলিল, শুধু তাহাই নহে, ওই শুন শ্যাম নিজেকেই সুদক্ষ বীর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং শ্যাম বড়লোক বলিয়া সকলে তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া জয়ধ্বনি দিতেছে।

রসনা চুলবুল এবং হাত নিশপিশ করিয়া উঠিল।

তর্জনী আস্ফালন করিয়া বিবেক কহিল, খবরদার, কিছু বলিও না বা করিও না। কেবল নীরবে দেখিয়া যাও এবং শুনিয়া যাও।

সবিনয়ে প্রশ্ন করিলাম, নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করিতে ক্ষতি কী?

বিবেক উত্তর দিল, মতামত কখনও নিরপেক্ষ হয় না। তোমার মতামত তোমার কাছে অথবা তোমার মতো বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে মূল্যবান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন আদর্শের লোকের অসদ্ভাব নাই। তোমার মতামতের মানদণ্ডটি সাড়ম্বরে আস্ফালন করিলে তুমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষচারী কতকগুলি শত্রু সৃজন করিবে মাত্র। পৃথিবীতে শত্রু সৃজন করা লাভজনক নহে। সুতরাং রসনা ও হস্ত সংযত করিয়া কেবল দেখিয়া ও শুনিয়া যাও। ইহাই হিতবাক্য।

বলিলাম, বহির্জগতের উত্তেজনা অথবা অবসাদে উত্তেজিত অথবা অবসন্ন হওয়া জীবমাত্রেরই প্রাণধর্ম।

বিস্মৃত হইও না, তুমি সাধারণ জীবন নহ—তুমি মনুষ্য।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ বাহ্যিক আন্দোলনে খামকা বিচলিত হওয়া প্রকৃত মানুষ্যের পক্ষে অকর্তব্য।

অবিচলিত পাষাণই কি তাহা হইলে মনুষ্যত্বের আদর্শ?

কে বলিল, পাষাণ বিচলিত হয় না? যে গাণিতিক নিয়মানুসারে পাষাণের আপাতস্থৈর্য দৃষ্টিগোচর করিতেছ, সেই গাণিতিক নিয়মানুসারেই পাষাণকেই অস্থির করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পাষাণের উপর ক্রিয়াশীল শক্তির তারতম্যের উপর তাহা নির্ভর করে। পাষাণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে। স্বকীয় শক্তিবলে বিক্ষোভকারী শক্তির প্রতিরোধ করিয়া নির্বাক থাকাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্তব্য।

নির্বিকার থাকিয়া লাভ কী?

লাভ? আধিভৌতিক লাভ কিছু নাই। শান্তি পাইবে। মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে তাহাই পরম কাম্য।

আধিভৌতিক শরীর ধারণ করিয়া আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করি। সুতরাং আধিভৌতিক লাভ ক্ষতি কি নিতান্ত অবহেলার বস্তু?

অবহেলার বস্তু নহে, অশান্তিজনক। সেইজন্যই পরিত্যাজ্য।

পরিত্যাজ্য বস্তুমাত্রেই পরিত্যাগ করা সহজ নহে। আধিভৌতিক জগতের উত্তাপ ও শৈত্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অভিভূত করিতেছে। সুতরাং বরফ এবং অগ্নির সাহায্য না লইলে চলিবে কেন?

সাহায্য লও, কিন্তু প্রয়োজনমতো এবং নির্বিকারে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ বরফ অথবা অগ্নি লইয়া আতিশয্য করিও না। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া প্রয়োজনমতো তাহাদের সাহায্য লও। তাহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার আবশ্যকতা নাই।

রামের প্রতি শ্যামের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে উচিত কি অনুচিত তাহা সরল বাংলায় ব্যক্ত কর।

চলিত বাংলায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, চাপিয়া যাও।

কেন?

রামের পক্ষ লইয়া শ্যামের বিরাগভাজন হওয়ার কোনো অর্থ হয় না।

আমি ন্যায়ের পক্ষ লইতে চাই।

ন্যায়শাস্ত্র ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিলে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ সম্যক নির্ধারণ করা স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে অসম্ভব। উহা লইয়া অনর্থক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিও না। স্বকীয় চরকায় নির্বিকারভাবে তৈলনিষেক করত শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা কর। রাম-শ্যামের মামলার নিষ্পত্তি তাহারা নিজেরাই করুক। ইহা লইয়া তোমার উত্তেজিত হইবার প্রয়োজন দেখি না।

প্রয়োজন নাই বুঝিলাম। কিন্তু আমি যে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন উপায় কী?

প্রশমিত হও।

বেখাপ্পা বিবেকের সহিত আর বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এইজন্যই বোধহয় সাধারণ মানুষ একা থাকিতে পারে না। একা থাকিলেই বিবেকের সহিত মুখোমুখি হইতে হয় এবং তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ সংসারী পাপী তাপী মানুষের বিবেক দংশনোন্মুখ, এবং তাহার দংষ্ট্রা বড় তীক্ষ্ণ। এইজন্যই বোধহয় অধিকাংশ লোক কাজে কর্মে আড্ডায় গল্পে গুজবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া নিজের বিবেকের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করে। একা থাকিলে বিবেক খুন করিয়া ফেলিবে।

রাম-শ্যাম-ঘটিত গল্পটি নিম্নলিখিত প্রকার।

রামবাবু আমাদের পাড়ার লোক। বেচারি ছাপোষা গরিব গৃহস্থ। কিন্তু তাঁহার আমগাছটির এ অঞ্চলে নাম আছে। বড় বড় আম, সুমিষ্ট, আঁশ নাই, অথচ পেট ভার করে না। রামবাবু প্রতি বৎসর আমগুলি বিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর আমিই সেগুলি কিনিয়া থাকি। এবার শ্যামবাবুও ক্রেতারূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্যামবাবুর প্রস্তাবিত মূল্য কিন্তু রামবাবুর মনঃপূত হইল না এবং তিনি শ্যামবাবুকে আম্র বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলেন। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে এ বৎসরও আমি আম্রগুলি পাইতে পারিব। কিন্তু অকস্মাৎ শ্যামবাবু পাঁচজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে রামবাবুর সমস্ত আমগুলি পাড়াইয়া লইয়া গেলেন। শোনা কথা নয়, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। দরিদ্র রামবাবুর বিপন্ন মুখচ্ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। ভীমদর্শন বরকন্দাজগুলোর সগুম্ফ হুমকিও দেখিতে পাইতেছি। নাহ্, ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

পথে যাইতে যাইতে প্রবীণ দিগম্বর সিঙ্গির সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিলাম।

শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন, কপালে তর্জনী ঠেকাইলেন এবং সর্বশেষে হাত দুইটা উল্টাইয়া আকাশের দিকে চক্ষু দুইটি তুলিলেন। সিঙ্গি মহাশয় স্বল্পভাষী লোক। তাঁহার বক্তব্য সাধারণত তিনি ইঙ্গিত দ্বারাই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ইঙ্গিতগুলির দ্বারা তিনি ঠিক কী ব্যক্ত করিলেন, তাহা সম্যক প্রকারে না বুঝিলেও রামবাবুর প্রতি তিনি যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন তাহা বুঝিলাম। আর একটু গিয়াই ভট্টাচার্যের দর্শন পাইলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামের গেজেট। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, শুনেছ ভায়া, মাগী সরেচে। আগেই বলেছিলাম, ও চিড়িয়া উড়বে—

প্রশ্ন করিলাম, কোন্ মাগী?

তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে হে! ওই তোমাদের মিস্ট্রেস—বালিকা-বিদ্যালয়ের বিদ্যেধরী—এখন নো ট্রেস। শাড়ির চটক দেখেই বুঝেছিলাম আগেই—

রাম-শ্যাম-সংবাদটিও ভট্টাচার্যের কর্ণগোচর করিলাম। ভট্টাচার্য বলিলেন, শ্যাম যে ও-রকম করবে তার আর বিচিত্র কী, মুখখানা দেখ নি ওর? ব্যাটা যেন রাঘব বোয়াল। রামবাবুকে বল, ঠুকে দিক এক নম্বর। হেবোকে বললেই সে সব ঠিক ক'রে দেবে। এ মগের মুলুক নয়, ইংরেজ রাজত্ব, ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না, হেঁ-হেঁ, হেবোকে পাকড়াও গিয়ে।

প্রতিশ্রুতি দিলাম, প্রয়োজন হইলে সদ্য পাশ-করা উকিল ভট্টাচার্য-তনয় হাবুলেরই শরণাপন্ন হইতে রামবাবুকে প্ররোচিত করিব। ভট্টাচার্য উৎসাহ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের পর যথাক্রমে চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার এবং ফড়িং মামার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল এবং সকলের নিকটেই শ্যামবাবুর অমানুষিক অত্যাচারের কথা যথাশক্তি নিবেদন করিলাম। সকলেই নিজস্ব ধরনে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে থানার নিকটবর্তী হইয়াছিলাম। দারোগাবাবুর সহিত স্বল্প চেনাশোনাও ছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার সহিতও এ বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, আইন কাহারও খাতির করে না। রামবাবু যদি নালিশ করেন এবং শ্যামবাবু যদি দোষী সাব্যস্ত হন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাজা হইয়া যাইবে। ধনী বলিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন না।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

দুই

উপরোক্ত ঘটনার পর এক মাস অতীত হইয়াছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিত সংক্ষিপ্ত সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য। বিনা মেঘে বজ্রপাত কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয়।

১। রামবাবুর সহিত শ্যামবাবুর হরিহর-আত্মা-জাতীয় মিলন সংঘটিত হইয়াছে।

২। পাঁচ হাজার টাকার দাবি করিয়া শ্যামবাবু আমার নামে মানহানির মকদ্দমা দায়ের করিবেন বলিয়া উকিলের চিঠি দিয়াছেন। হাবুলই উকিল।

৩। দিগম্বর সিঙ্গি, ভট্টাচার্য মহাশয়, চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার, ফড়িং মামা এবং থানার দারোগা সত্যনিষ্ঠার খাতিরেই সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ইঙ্গিতপ্রবণ দিগম্বরই প্রধান সাক্ষী শুনিতেছি। রামবাবুও শুনিলাম বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুস্থ-মস্তিষ্কে তাঁহার গাছের আম শ্যামবাবুকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়াছেন এবং রশিদ লিখিয়া দিয়াছেন।

পাঁচ হাজার টাকা আমার নাই। সুতরাং জেল অনিবার্য।

তিন

হিতৈষী প্রতিবেশী চৌধুরী মহাশয় এইমাত্র বলিয়া গেলেন যে, আমি গিয়া শ্যামবাবুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেই সমস্ত ব্যাপার অবিলম্বে মিটিয়া যাইবে। কারণ তাঁহার মতে শ্যামবাবু লোকটি একটু রগ-চটা হইলেও দিল-দরিয়া। কী করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কঠোরকণ্ঠে বিবেক কহিল, ক্ষমা-প্রার্থনা করিও না।

কেন?

শাস্তিই মনুষ্যের কাম্য। এ অবস্থায় জেলের ভিতরেই তুমি অধিক শান্তি পাইবে। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য কিছুদিন কারাবরণ তোমার কিছুমাত্র অমর্যাদা হইবে না।

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, এবং কিছু শিক্ষাও হইবে।

এমন সময় আর একটি বজ্র পড়িল। এটিও বিনা মেঘে।

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমার সময় কম, মাছ ধরিতে যাইতেছি। কেবল একটি সুখবর দিতে আসিয়াছি। জজ সাহেব বদলি হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার প্রিয়তমা শ্যালিকার পাণিপীড়ক, অর্থাৎ আমার ভায়রাভাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বদলি হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানেও সৌভাগ্যক্রমে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার বাল্যবন্ধু। সুতরাং চল, এই সুযোগে শ্যামবাবুকে একদিন চাবকাইয়া আসা যাক। আমার নিকট খুব ভালো একটা হান্টার আছে।

মুচকি হাসিয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

চার

দামি কার্ডখানা হাতে লইয়া বসিয়া আছি। ইহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, শ্যামসুন্দর দে অত্যন্ত বাধিত হইবেন, যদি আমি অদ্য সন্ধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উদ্যান-উৎসবে যোগদান করি। ইংরেজিটুকুর অনুবাদ করিলে ইহাই অর্থ হয়। যিনি কার্ডটা দিয়া গেলেন, তিনি ইহাও বলিয়া গেলেন যে, নবাগত জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রাণকান্তও।

একটু পরে প্রাণকান্ত আসিলেন। বলিলেন, আর ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কাজ নাই। মধুরেণ সমাপয়েৎ করাই ভালো। পরে প্রয়োজন হইলে হান্টার তো আছেই। এখন ভোজটা ছাড়ি কেন?

পাঁচ

ভূরিভোজনের পরে যখন ফিরিলাম, তখন রাত্রি অনেক। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন!

একটা ভীষণদর্শন বলিষ্ঠ লোক কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড একটা কলসি। প্রশ্ন করিলাম, কী খুঁজিতেছেন?

আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি।

দড়ি? আপনি কে?

তোমার বিবেক, রাস্কেল!

জৈবিক নিয়ম

বেচারার দোষ ছিল না। এ অবস্থায় সব যুবকই এমনই করিয়া থাকে। জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্মই এই। মনে হয়, বুকটা একটু ফুলাইয়া চলি, মাথাটা একটু উঁচাইয়া রাখি ; হাব-ভাবে চলনে-বলনে পৌরুষের মাহাত্ম্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক ! মেয়েটি তাহা দেখুক, অনুভব করুক, একবারও অন্তত মনে মনে ভাবুক—বাহ্, বেশ ছেলেটি তো। অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে, পেশিগুলির মধ্যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়, শিরায় শিরায় শোণিতস্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে, বাহুল্য ও আতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে-অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাহাকে নিজস্ব ধরনে, নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।

সেদিন প্লাটফর্মে রোগাগোছের ছোকরাটি তাহার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও যাহা করিতেছিল, তাহা এই সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতেই করিতেছিল। নিরপেক্ষভাবে নিরীক্ষণ করিলে ছোকরাটির মধ্যে তেমন অসাধারণ কিছু ছিল না। শাদা-টুইলশার্ট-পরা উনিশ-কুড়ি বছরের একটি রোগা ছোকরা গোঁফ উঠি-উঠি করিতেছে। পায়ে শস্তা চটকদার একজোড়া স্যান্ডাল।

অদূরে একটি কমবয়সী মেয়ে বসিয়া আছে।

স্টেশনটি অতি ছোট।

প্লাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জন-চারেক যাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে জন-দুই সাঁওতাল। তাহারা মোটঘাট লইয়া একটু দূরে বসিয়াছিল। বাকি দুইজনের মধ্যে একজন ওই রোগাগোছের ছোকরা এবং আর একজন ওই তরুণীটি। এদিকে-ওদিকে দুই-একটি কুলি ফেরিঅলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রেলের বাবুরা নিজ নিজ কামরায় কাজ করিতেছেন। এই নিরীহ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ছোকরাটির অন্তরে কেমন যেন একটা উদ্দীপনা অকারণে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোকরাটি অবশ্য মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

উত্তেজনার আধিক্য সম্ভবত সেইজন্যেই।

ছোকরা কণ্ঠস্বরকে অকারণে অসম্ভব রকম পৌরুষ করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—কুলি, কুলি, এই কুলি—

একটি কুলি আসিল।

কী বাবু ?

আমার মোটটা ট্রেনে উঠিয়ে দিবি। বুঝলি ?

আচ্ছা বাবু।

কত নিবি ?

চার পয়সা বাবু।

চার পয়সা কেন, চার আনা দেব তোকে। ভালো দেখে একটা গাড়িতে চড়িয়ে দিস, কেমন ?

বিস্মিত কুলি বলিল, আচ্ছা বাবু।

ঠিক পারবি তো?

ঠিক পারব বাবু।

বহুৎ আচ্ছা।

ছোকরাটি কুলির পিঠটা চাপড়াইয়া দিল।

কোনটা আপনার মোট বাবু?

একটি ছোট সুটকেস ছাড়া অবশ্য অন্য কোনো গুরুতর মোট ছিল না। ছোকরা তাহাই দেখাইয়া দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, ট্রেন আজ লেট আসছে নাকি?

আধ ঘণ্টা লেট বাবু।

রিপোর্ট করব আমি।

কাহার কাছে এবং কাহার নামে রিপোর্ট করিবে, তাহা অবশ্য অনুক্তই রহিল।

কুলি চলিয়া গেল।

ছোকরা দৃপ্তভাবে রোষকষায়িত লোচনে তরুণীর সম্মুখে খানিকক্ষণ পদচারণা করিল এবং কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া রুষ্টভাবটা একটু প্রশমিত হইলে মুখটি সুচালো করিয়া শিস দিতে লাগিল। খানিকক্ষণ শিস দিবার পর আবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আদেশের ভঙ্গিতে ডাকিতেছে—সোডা, সোডা, এই সোডা, ইধার আও।

সোডা-বিক্রেতা সমীপবর্তী হইল।

একঠো সোডা দেও। জলদি করো।

দাম দু আনা বাবু—

কুছ পরোয়া নেই—দেও তুম।

এই বলিয়া যেন দেখিতেছে না এইভাবে সে মেয়েটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। বলা বাহুল্য, মেয়েটিও ছেলেটিকে লক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ চোখাচোখি হইয়া যাওয়াতে মেয়েটি তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল।

লিজিয়ে বাবু।

ফেনায়িত সোডার বোতলটা ধরিয়া কৃশ যুবকটি সগর্বে পা ফাঁক করিয়া ঊর্ধ্বমুখে সোডা পান করিতে লাগিল। সোডা-পান করাটাও যেন মস্ত একটা বীরত্ব!

ইতিমধ্যে একটা চানাচুরঅলা আসিয়া জুটিল।

মেয়েটি ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া চানাচুর খরিদ করিতেছে দেখিয়া যুবকটিও সেইদিকে আগাইয়া গেল।

কী দর তোমার চানাচুরের হে?

এক পয়সা ঠোঙা বাবু।

ওইটুকু ঠোঙা এক পয়সা! যেরকম সাইজ, পয়সায় চারটে করে হওয়া উচিত। সিমপ্লি এ কাটথ্রোট! পয়সায় চার ঠোঙা করে দিবি?

পারব না বাবু।

পারব না মানে?

চানাচুরঅলা বলিল, ছোলার দর আজকাল বাবু—

ছোলার দর আজকাল কত? বেশ তো, খতিয়েই দেখা যাক।

রুখিয়া ছোকরা আগাইয়া গেল।

ওসব কথা ছেড়ে দিন বাবু। বেকার বাত বাড়িয়ে ফয়দা কী। লেবেন আপনি চানাচুর? ক'ঠোঙা চাই?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ছোকরা একবার আপাদমস্তক চানাচুরঅলাটাকে দেখিয়া লইল। তাহার পর বলিল, ক'ঠোঙা? তোর যত চানাচুর আছে সব কিনে নিতে পারি আমি, জানিস? কী ঠাউরেছিস তুই আমাকে?

উত্তরে চানাচুরঅলা দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল।

হাসছিস যে বড়? কত চানাচুর আছে তোর? দাম কত হবে?

এক টাকা বাবু।

ছোকরা তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলিয়া ঠঙ করিয়া একটা টাকা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। চানাচুর-বিক্রেতা এতটা প্রত্যাশা করে নাই। কী গভীর মনোবৃত্তি যে ছোকরাকে নাচাইতেছে, তাহা মূর্খ বেচারা কী করিয়া বুঝিবে? টাকা লইয়া সে চলিয়া গেল।

এত চানাচুর লইয়া ছোকরা কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়িল।

একটু ইতস্তত করিয়া মেয়েটিকে বলিল, আপনি আরও কিছু নিন।

না, না, আমার আর চাই না।

কুণ্ঠিতা তরুণী সলজ্জভাবে মাথা নাড়িল।

এতগুলো নিয়ে আমি কী করব? রেখে দিন কিছু আপনি।

অনেকগুলি ঠোঙা সে তরুণীটির পাশে বেঞ্চিটার উপর একরকম জোর করিয়াই রাখিয়া দিল। ইহার দৃষ্টিকটুতা তরুণীকে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে বেচারা কী আর করিবে। লজ্জায় আনত নয়নে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনো ভদ্র উপায় তাহার মাথায় আসিল না।

বাকি ঠোঙাগুলি সুটকেসের উপর রাখিয়া আসিয়া ছোকরা সহাস্যমুখে বলিল, ওগুলো ট্রেনে যেতে যেতে ধীরেসুস্থে শেষ করবেন। কোথা যাচ্ছেন আপনি? এই ট্রেনেই যাচ্ছেন তো?

মেয়েটি লজ্জা পাইয়াছিল। মৃদুস্বরে বলিল, আমি পরের ট্রেনটায় যাব।

ও, তাই নাকি!

ছোকরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার পায়চারি শুরু করিল। বুক চিতাইয়া উন্নত মস্তকে অকারণ পুলকে বেশ খানিকক্ষণ পদচারণ করিল।

আবার থামিল।

তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া হাতের পেশিগুলি টিপিয়া দেখিতে লাগিল। পেশি অবশ্য বেশি ছিল না। কিন্তু যতটুকু ছিল, ততটুকুই বা ফুলাইতে ক্ষতি কী।

একটু শিস দিল।

যৎসামান্য গোঁফটুকুতে দুই-একবার তাও দিল।

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল, প্লাটফর্মের ওধারটায় একটা কৃষ্ণচূড়াগাছের পুষ্পিত ডাল প্লাটফর্মের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সে তখন সেইদিকে গেল এবং লাফাইয়া ডালটাকে ধরিয়া ফুল পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া কিছু ফুল পাড়িলও।

শ্রান্তদেহে একগোছা কৃষ্ণচূড়া ফুল লইয়া আবার সে মেয়েটির কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন আসিয়াছে।

কুলিটা সুটকেস ও চানাচুরের ঠোঙাগুলি একটা ফাঁকা গাড়িতে তুলিয়া দিয়া চার আনা পয়সাই পাইল।

ছোকরা গাড়িতে উঠিয়া জিনিসপত্রগুলি ঠিকমতো রাখিয়া আবার নামিয়া আসিল।

উপবিষ্ট তরুণীটির পানে একবার চাহিয়া দেখিল।

দেখিল, তরুণীও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

গার্ড বাঁশি বাজাইয়া সবুজ নিশান নাড়িলেন।

ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল।

তখনও ছোকরা ট্রেনে উঠে না।

ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশ বাড়িয়াছে, তখন সে শেষ বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য সহাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নিচে—চাকার নিচে পড়িয়া গেল।

আর কিছু করিবার সুযোগ সে পাইল না।

দিবা দ্বিপ্রহরে

এক

ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

দারুণ দ্বিপ্রহর। খর রৌদ্র চতুর্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। সাধারণত এ সময়ে লোকে ঘরের বাহির হয় না। আজ কিন্তু একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এত লোকের ভিড়। আজ সকালে হারু ঘোষের পুত্রকে দংশন করিয়া যে সাপটা নিকটস্থ ইটের গাদার ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিল, সেটা মারা না পড়িলেও ধরা পড়িয়াছে। বিশু বাগ্‌দী সাবধানে ইট সরাইয়া সাপের লেজের দিকটা শুধু যে দেখিতে পাইয়াছে তাহা নয়, বল্লম দিয়া গাঁথিয়া সাপটাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে। দেখিবার মতো দৃশ্য বটে। গ্রামের সমস্ত লোক সভয়বিস্ময়ে দেখিতেছে। সিদ্ধমনস্কাম বিশু বাগ্‌দী সগর্বে জাহির করিতেছে যে এমন মোটা এমন লম্বা এমন ফণা ও গর্জন-বিশিষ্ট গোক্ষুর-সর্প সে আর কখনও দেখে নাই। সত্যই সর্পটি ভয়ঙ্কর।

দুই

একটু দূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জনৈক ব্যক্তি খানিকটা ছাতু খাইতেছিল। ভিড়ে যোগদান করে নাই। লোকটির চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন। পরিধানে একটা ময়লা হাফ-প্যান্ট এবং একটা ময়লাগোছের ফতুয়া। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে ছাতু লাগিয়া চেহারাটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়াছে। নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে আপনমনে সে ভোজন করিতেছিল। এমন সময়ে ভিড়ের ভিতর হইতে একটা কলরব

উঠিল। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া জনতার দিকে সে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর কী মনে করিয়া একটু হাসিল এবং অবশেষে উঠিয়া ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবখানা—ব্যাপারটা কী দেখাই যাক না! ভিড়ের নিকটে গিয়া একজন লোককে প্রশ্ন করিল, এখানে এত ভিড় কিসের?

গোখরো সাপটা ধরা পড়েছে—

কোন গোখরো-সাপ?

যে গোখরো-সাপটা ন্যাপলাকে আজ সকালে কামড়েছিল।

ন্যাপলা কে?

হারু ঘোষের মেজছেলে।

তাই নাকি? বেঁচে আছে এখনও?

বেঁচে আছে এখনও। ডাক্তারবাবু এসে তিন-চারটে বাঁধন দিয়ে কেটেকুটে কী সব ওষুধপত্তর লাগিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা কিন্তু খারাপ।

ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না, কিৎসু হবে না।—বলিয়া আগন্তুক সহাস্যে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করিয়া বলিল, না হলেই বা উপায় কী?

বিস্ফারিতনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া আগন্তুক বলিল, উপায় কী? আলবৎ উপায় আছে। মন্তর ঝাড়ব আর উঠে বসবে। চালাকি নাকি? কই দেখি, সাপটা কোথায়? ডাক ন্যাপলাকে।

তিন

দেখিতে দেখিতে জনতা সাপ ছাড়িয়া আগন্তুককে লইয়া পড়িল। দ্রুতবেগে রটিয়া গেল একজন মস্ত গুণী ওঝা আসিয়াছেন। হারু ঘোষকে খবর দিতে লোক ছুটিল, এবং খবর পাইবামাত্র তিনি সর্পাহত পুত্রটিকে লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল, পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

তৎক্ষণাৎ পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল।

এইবার সাপটাকে ছেড়ে দাও।

বিশু বাগ্‌দী বলিল, ছেড়ে দিলে ফের যদি ছুটে গিয়ে কামড়ায় কাউকে?

কামড়াবে? আচ্ছা, আমি ধরছি, খুলে নাও তুমি বল্লম। কামড়াবে, চালাকি নাকি?

নির্ভয়ে আগাইয়া গিয়া আগন্তুক সাপটাকে ধরিল। ধরিবামাত্র সাপটা সগর্জনে তাহার ডান হাতে একটা ছোবল বসাইয়া দিল। ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আগন্তুক বাম হাতে সাপটাকে ধরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, খুলে নাও বল্লম।

একটু ইতস্তত করিয়া বিশু বাগ্‌দী অবশেষে বল্লমটা খুলিয়াই লইল। সাপটা আগন্তুকের বাম হাতে দংশন করিল এবং বহু পাকে সমস্ত হাতখানা বেষ্টন করিয়া ধরিল। আগন্তুকের সমস্ত মুখে অদ্ভুত হাসি। ছাতু-মাখা খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভেদ করিয়া বিকট একটা অট্টহাস্য চতুর্দিক কাঁপাইয়া তুলিল।

রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও, চুমু একটা আমাকে—

ক্রুদ্ধ বিষধর তাহার এ অনুরোধ রক্ষা করিল।
তৎক্ষণাৎ গণ্ডদেশে একটা করাল চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

চার

সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নাই। উত্তেজিত জনতা কলরব করিতেছে। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।

দারোগা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া আগন্তুকের মুখটা ভালো করিয়া অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, একেই তো আমরা খুঁজছি।

শোকার্ত হারু ঘোষ বলিলেন, এ কে বলুন তো?

এ একটা পাগল। পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। একে ধরবার জন্যে চারিদিকে ফটো পাঠিয়ে হুলিয়া করা হয়েছে।

বিশু বাগ্‌দী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। তিক্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, পাগল নয় কে? সবাইকে ধরে পাগলা-গারদে পুরুন আপনি হুজুর! ছি ছি ছি ছি! কী কাণ্ড!

* * *

অন্ধকার ঘনীভূত হইতে জনতা ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

চিঠি পাওয়ার পর

এক

সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিতেছে না।

তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব—এই আশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। যাহাকে জন্মের মতো ছাড়িয়াছিলাম, আবার যে তাহাকে দেখিতে পাইব—এ কল্পনাও করি নাই। সে যে এ-পথে আবার আসিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। সে আসিতেছে এবং আমি তাহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমার বিগত স্বপ্নজীবন পুনরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য, যদিও তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে, তথাপি এই ঘটনাকে আমার জীবনের বৃহত্তম ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। যত কম সময়ের জন্য হউক এবং যেভাবেই হউক, তাহাকে আর-একবার দেখিতে পাইব তো! তাহাই যে পরম লাভ। চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িলাম।

শ্রীচরণেষু,

উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ি পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌঁছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেকদিন আপনাকে দেখি নি। দেখতে ইচ্ছা করে। আসবেন তো? আশা করি, আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।

অমিতা

দুই

কিছু ভুলি নাই।

অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি তাহাদের সমস্ত বর্ণসুষমা লইয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই দিনটির কথা, যেদিন অনেক ইতস্তত করিয়া আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে প্রথম প্রণয়-নিবেদন করিয়াছিলাম। মনে ভয় ছিল, যদি সে ভুল বোঝে—যদি সে রাগ করে। কিন্তু সে কিছুই করে নাই। স্মিতমুখে সহজভাবে সে আমার নিবেদন শুনিয়াছিল। তাহার লজ্জারুণ কপোল, আকম্পিত অধর, আনন্দিত নয়ন—তাহার সেদিনকার সম্পূর্ণ আলেখ্যখানি আমার মনের পরতে পরতে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। কখনও বিলুপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ সুখ মানুষের জীবনে বহুবার আসে না। আমার জীবনে একবার মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিবে না। তাহাও জানি। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইবে। ভুলিলে চলিবে কেন? ভুলি নাই, এক দণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই তাহা সত্য, কিন্তু আমার অন্তরলোকে যে আসন তুমি অলঙ্কৃত করিতেছ সে আসন এখনও অবিচলিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তুমি তো আমাকে চাহিয়াছিলে—সমস্ত প্রাণ দিয়াই চাহিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে লইতে পারিলাম কই? তোমাকে ভালোবাসি বলিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে হইল। আমার দুর্ভাগ্য দিয়া তোমাকে লাঞ্ছিত করিতে আমি কিছুতেই পারিলাম না। আমার দুর্ভাগ্য আমি একাই বহন করিব ইহাই আমার ললাটলিপি। তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন? তোমাকে ভালোবাসিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

তিন

ভগবান বলিয়া কেহ আছেন হয়তো। এই নিখিল বিশ্বের কার্যকলাপ তাঁহারই অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—এই ধারণা করিয়া নির্মম নির্যাতনের মধ্যে আমরা কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি। তাহা না হইলে অসহায় মানব অকারণ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিত না। কে একজন মনীষী নাকি বলিয়াছেন, ভগবান যদি না-ও থাকেন, নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একটা ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। মানুষের পক্ষে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক। আমিও আমার এই দুর্ভাগ্যটাকে অমোঘ বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। মানিয়া লইয়াছিলাম যে, যিনি আমার স্বপ্নসৌধশীর্ষে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৃষিত-অধরসমীপবর্তী সুধাপাত্রকে যিনি অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতে বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি করুণাময় পরমেশ্বরই। যাহা করিয়াছেন, তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে আমরা যে অপারগ তাহাই নয়—অনধিকারী। নিরুপায় মন এই যুক্তি মানিয়াছিল। অমিতার পিতামাতার আপত্তি ছিল না। আমার দিকে পিতামাতাই ছিল না। তবু বিবাহ হইল না। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, হঠাৎ একদিন কাশিতে কাশিতে এক ঝলক রক্ত আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত শুনিয়াও অমিতা কিন্তু আমাকে চাহিয়াছিল। আমি কিন্তু পারিলাম না।

বিবেকে বাধিল।

চার

অমিতার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল।

অমিতার মতো পাত্রী পড়িয়া থাকে না। সুন্দর স্বভাব, সুন্দর চেহারা, সুন্দর শিক্ষা। অমিতার মতো মেয়ে বাংলাদেশে বেশি নাই। আমার চোখে তো আর একটাও পড়িল না। রূপসী শিক্ষিতা মেয়ে হয়তো অনেক আছে, কিন্তু অমন মৃদু, অমন স্নিগ্ধ, অমন সুমিষ্ট স্বভাব তো আর কোথাও দেখিলাম না। অমিতার পিতামাতা অমিতার জন্য যে-পাত্রটিকে নির্বাচিত করিলেন, তিনিও অমিতার উপযুক্ত। বড় বংশের ছেলে, বড় চাকরি করেন। স্বাস্থ্যবান সুরূপ ভদ্রলোক। কোনোদিক দিয়াই কোনো খুঁত নাই। আইনত অমিতার সুখে থাকিবার কথা। হয়তো সুখেই আছে। কিন্তু কেন জানি না, আমার অন্তরনিবাসী অবুঝ ব্যক্তিটির বিশ্বাস—অমিতা সুখে নাই। আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলেই বেশি সুখী হইত। যদিও আমি অমিতার স্বামীর অপেক্ষা সবদিক দিয়াই নিকৃষ্ট, তথাপি মনে হয়, অমিতা এখনও মনে মনে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত যুক্তিহীন এই স্বপ্নটাকে আমি মনে মনে আঁকড়াইয়া আছি যে, তাহার স্বামীর বড় বংশ, ভালো চাকরি, সুন্দর রূপ, অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে ততটা সুখী নয়— যতটা সুখী সে হইতে পারিত যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম। হয়তো ইহা আমার অহমিকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অহমিকাটুকুকে আশ্রয় করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। সর্বগ্রাসী জলপ্লাবনে সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকার ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু শুধু জাগিয়া আছে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিয়া আছি।...

আবার তাহার চিঠিখানি পড়িলাম।

পাঁচ

দেখা হইলে কী বলিব তাহাকে?

এতদিন পরে দেখা—পাঁচ মিনিটের জন্য। স্টেশনের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কী তাহাকে বলিব? অথচ বলিবার কত কথাই মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিব কেমন করিয়া? হয়তো কিছুই বলা হইবে না। হয়তো অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্নের ভিতর দিয়াই এই অতিশয় মূল্যবান পাঁচটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবে। জীবনে হয়তো তাহার সহিত আর দেখাই হইবে না। হয়তো...সহসা মনে হইল, তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম।

ছয়

সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের ডালমুট অমিতার বড় প্রিয়বস্তু ছিল। নানা স্থানে ঘুরিয়াও ঠিক সেরকম ডালমুট জোগাড় করিতে পারিলাম না। হয়তো এখানকার জিনিস তাহার পছন্দ হইবে না। একজনকে ফরমাশ দিয়াছি। সে আশ্বাস দিয়াছে, সন্ধ্যা নাগাদ

ভালো ডালমুট প্রস্তুত করিয়া দিবে। ডালমুট ছাড়া অমিতার জন্য আর যে কী লইয়া যাইব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

*　　　　*　　　　*

জামাকাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে।

মেসের চাকরটাও ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছে। নিজেই একটা জামা ও কাপড়ে সাবান দিতে বসিলাম। ময়লা জামাকাপড় পরিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব না।

*　　　　*　　　　*

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মনে পড়িল, কিছু গোলাপফুল জোগাড় করিয়া লইয়া গেলে হয়। লাল নয়—শাদা গোলাপ। নরেনদের বাড়িতে আছে—গেলেই পাইব। হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও দেরি আছে। নরেনের বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নরেনদের বাড়ি হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন চতুর্দিক অন্ধকার। বড় বড় শাদা গোলাপগুলি অতি সুন্দর। অমিতা নিশ্চয়ই খুশি হইবে। ফুলগুলি পাইতে কিন্তু দেরি হইয়া গেল। নরেন বাড়ি ছিল না, মালীটাও বাহিরে গিয়াছিল। রাস্তায় নামিয়া হাতঘড়িটা আর একবার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ট্রেনের এখনও একঘণ্টা দেরি আছে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। যে লোকটাকে ডালমুটের ফরমাশ দিয়াছিলাম, সে এখান হইতে কিছুদূরে একটা গলির মধ্যে থাকে। গেলাম সেখানে।

আট

স্টেশন।

নানা ধরনের যাত্রী নানা ধরনের জিনিশপত্র লইয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্যমনস্কভাবে প্লাটফর্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা বেদনাময় অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? একজন রেলওয়ে-কর্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসিবার আর কত দেরি আছে?

তিনি নির্বিকারভাবে বলিলেন, সে ট্রেন তো আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। এ অন্য ট্রেন আসছে। এখন তো সাড়ে নটা।

সে কি!

নিজের হাতঘড়িটা দেখিলাম।

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে!

সহসা মনে হইল, আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই। অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিলোত্তমা

এক

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ পর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মতো সেও বি.এ. পাশ করিয়া এখানে-ওখানে আড্ডা দিয়া, তাশ খেলিয়া, পথের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারাণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনই আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি-ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে কোনোকালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কুষ্টি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে-পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন তাহার নাম তিলু, ভালো নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে-ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

দুই

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতোই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি—নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটি হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে, অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচশত টাকা পণ কম দিয়াছে, বলিতেছে—এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলির রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। আংটিটা সোনার কিনা কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মতো। তিনি শেষে একটি ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? তখন তিনি যাহা

দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা তাহাতেই রাজি হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশি করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিত হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি? সব জিনিশেরই একটা হিসাব আছে তো। কিন্তু এ কী কাণ্ড! ওই অতিবিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল? বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বারবার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে নকুলের ভীমরতি ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজপুত্রের জন্য ওই পেতনিকে বউ করিয়া আনিতে পারে? ছি ছি ছি ছি!

নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ গোলগাল গড়ন। চোর—চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।' সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমনকি গোকুল পর্যন্ত।

তিন

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বইকি! একটি জিনিশ গোকুল লক্ষ না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভালোমানুষ। মুক্তকেশী বেগুনের মতো তাহার মুখখানিতে ভালোমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু সে করিল না। সসঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কী? সে প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করিতেছে সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকার হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখস্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ কোলাহল ভুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো? হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।

তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিল, হলেও তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

চার

বৎসরখানেক কাটিয়া গেল।

তিলুর সম্বন্ধে মোহমুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানে লেখাপড়া, না জানে গানবাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মতো খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। তিলোত্তমা তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি না, বকুলবনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানির সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাঁচ

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও অ্যান্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রিক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতায় যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনো পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমনকি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রুপোর কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিত মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে একে সবই ছাড়তে হল। এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা!

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমনকি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করবে বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?

এখনও হয় নি।

আর-এক খিলি পান এবং আর-একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন—দেখ বাবা, তাহলে সব কথা খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মতো একটি পাত্র খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পালটি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল, তাহলে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

উষাকে আগে দেখ তুমি! তোমার যদি পছন্দ হয়, তাহলে—

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার স্ত্রী বর্তমান আছে, সে-কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে উষা! তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া গানবাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মতো অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তাছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—অ্যাঁ, কী বল?

তা তো ঠিকই।

তাহলে সে স্ত্রী থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী—অ্যাঁ, কী বল?

তা তো ঠিকই।

ছয়

উষা উষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রকিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখেমুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌরসারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কূল হারাইল।

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়িভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়—আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত ঘটাইতে পারিলে নগদ দশহাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি নাকি কলঙ্ক আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু-যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত করিল এবং সে শর্তেও গোকুল, গোকুলের মা-বাবা সকলে রাজি হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না। এত কাণ্ড হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। গোকুল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়া শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জনে দেখা হয় নাই, এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বইকি! গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কী?

আজ আশীর্বাদ মনে আছে তো?

আছে!

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবারও যাও যদি দয়া করে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাইগাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

নয়

আশীর্বাদের সাজসরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজসরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে, এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন—শাঁখটা বাজায় কে? আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রন হয়েছে আবার। ও বউমা, কোথায় গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও।

শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

নাথুনির মা

Fixity of purpose—এর বাংলা কী?

উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা?

যাহাই হোক, ইহার সুন্দর একটি উদাহরণ সেদিন দেখিয়াছিলাম। গল্পটি বলিবার পূর্বে 'লক জ' কাহাকে বলে, তাহাও বুঝানো দরকার। 'লক জ' (Lock Jaw) তাহাকেই বলে, যাহা হইলে ব্যায়ত আনন আর বন্ধ হয় না, ব্যায়তই থাকে। হাই তুলিতে গিয়া অনেক সময় এই বিপদ ঘটে—মুখ কিছুতেই বোজে না, হাঁ করিয়া থাকিতে হয়, যতক্ষণ-না কোনো ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসাইয়া দেন। ইহার ঠিক ডাক্তারি নাম—ডিসলোকেশন অব ম্যান্ডিবল (dislocation of mandible)—একবার হইয়া পড়িলে 'সঙিন পরিস্থিতি'।

একটি রোগীকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিতে হইয়াছিল। সকালে চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতেছিল না। গৃহিণীর বারম্বার তাগাদা সত্ত্বেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম।

কড়কড় শব্দে—বাজ পড়িল না, দুয়ারে কড়া নড়িল।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি আধ-ঘোমটা দেওয়া কমবয়সী মেয়ে একটি বুড়িকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিনিতে পারিলাম—নাথুনির স্ত্রী ও মা। ইহাদের বাড়িতে ইতিপূর্বে চিকিৎসা করিয়াছি। নাথুনি স্থানীয় ময়দার কলে চাকরি করে।

কী হল?

বুড়ি নীরব।

নাথুনির বউ বলিল, মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বুজছে না। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

তাই নাকি? দেখি—

দেখিলাম, ঠিক তাই—বুড়ির 'জ' স্থানচ্যুত হইয়াছে।

নাথুনি কোথায়?

নাইট-ডিউটি থেকে ফেরে নি এখনও।

এরকম হল কী করে? হাই তুলতে গিয়ে?

বধূই উত্তর দিল (বুড়ির পক্ষে কথা বলা অসম্ভব)—না, হাই তুলতে গিয়ে নয়।

তবে?

এমনি।

এমনি কী করে হবে, কিসের জন্য হাঁ করেছিলে?

বধূটি তখন ঈষৎ হাসিয়া অবনত মস্তকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সসঙ্কোচে বলিল, মা আমাকে গাল দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ গাল দেবার পর যেই 'পোড়ারমুখী' বলতে গেছেন, অমনি 'পোড়ার' পর্যন্ত বলেই—

মুখে আঁচল দিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে হাস্য গোপন করিল। বুড়ি চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ হয়েছে?

আধঘণ্টা হবে।

আচ্ছা, ব'স তোমরা, এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি আমি।

ভাবিলাম, মুখরা বুড়িটা আর-একটু শাস্তি ভোগ করুক, আমি ততক্ষণ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া লই।

রোগী দেখিবার ঘরটায় তাহাদের বসাইয়া আমি ভিতরে চলিয়া গেলাম।

ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

আসিয়া বিধিমতো দুই হাতের দুইটা বুড়ো আঙুল বুড়ির মুখগহ্বরে পুরিয়া নিচের চোয়ালের হাড়টায় জোরে চাপ দিয়া টান দিলাম। খুট করিয়া হাড় যথাস্থানে বসিয়া গেল।

মুখ হইতে বুড়া আঙুল দুইটি বাহির করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি বলিল, মুখী!

নিমগাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!

কেউবা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই.....

কিম্বা ভেঙে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

বলে—'নিমের হাওয়া ভালো, থাক্, কেটো না।'

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর-এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,—'বাহ্, কী সুন্দর পাতাগুলি...কী রূপ! থোকা-থোকা ফুলেরই বা কী বাহার...একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ্—'

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক এক দশা।

তাজমহল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম, তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছয় নি। একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন, ওই-যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো—ওই তাজমহল ! তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম ! হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল ; অবসন্ন অপরাহ্ণে বন্দি শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল। আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি...মহাসমারোহে মিছিল চলেছে, সম্রাট শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া সন্নিধানে? আর বিচ্ছেদ সইল না...শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে...ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল... হয়তো এখনও আছে... ওই তাজমহলেরই পাশে। দারাসেকোর...

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠে নি; জোছনার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্বদিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মরধ্বনি কানে এল। ঝাউবীথি থেকে নয়—মনে হল, যেন সুদূর অতীত থেকে; মর্মরধ্বনি নয়—যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনাপটে। চাঁদ উঠল। জোছনার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহানমহীষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধদৃষ্টিতে নির্বিকার হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেকদিন কেটেছে।

কোন কন্ট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেলঅলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিঅলাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট-পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কী ভীষণ ভাড়া নেয়—এসব খবরও পুরনো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জোছনালোকে, সন্ধ্যা, উষায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে, আর চোখে লাগে না, চোখে পড়েই না...পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু— !

গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সেদিন 'আউটডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকল। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে বেচারির। ভাবলাম, কোনো মেওয়াঅলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম, ঝুড়ির ভেতর—মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা-পরা ধবধবে শাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে। নিতান্ত গরিব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল—ক্যাংক্রাম অরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকে গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ-রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার 'ইনডোরে'ও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষপর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ! অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউন্ডার, ড্রেসার এমনকি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজি হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে। সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হল বারান্দা থেকে। হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেকশন দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি কল থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজের দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠকঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম, হাসপাতালের বারান্দাতে নিয়ে চল আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে, এর বাঁচবার কি কোনো আশা আছে, হুজুর?

সত্যিকথাই বলতে হল, না।

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি, গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে। সেদিনও কল থেকে ফিরছি—একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কী যেন করছে বসে বসে, ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কী করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে নাকি? এগিয়ে গেলাম। কতগুলো ভাঙা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কী যেন গাঁথছে!

কী হচ্ছে এখানে মিঞা সাহেব?

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর!

কবর?

হাঁ হুজুর।

চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি থাকো কোথায়?

আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-পরবয়।

দেখি নি তো কখনও তোমাকে। কী নাম তোমার?

ফকির শা-জাহান!

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুই ভিক্ষুক

এক

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারিটি বসে থাকে। পোড়া পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমনকি অন্যান্য ভিখারিরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে সসঙ্কোচে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভিড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারিটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানাজনের নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা পয়সা, ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি এমনকি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানারকম। ভিখারি কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জন হলে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি করে বেঁধে লাঠি ঠকঠক করে গঙ্গার ঘাটে যায়—তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায় নি। কাপড় বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে!

দুই

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর-একটি ভিখারির আবির্ভাব হল সেই পথে—ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট পড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারিটি এসে প্রথম ভিখারির কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না, চলে যাচ্ছিল, সহসা প্রথম ভিখারি পুলকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা হয়ে গেল—মাথার চুল সোনালি। চেহারাই বদলে গেছে একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে উঠল—আমায় ক্ষমা করে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি—

ন্যুব্জদেহ ভিখারি ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল, ক্ষমা কর আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি।

এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারি জীবনযাপন কর গিয়ে, যদি কোনোদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে, তাহলেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ....

ন্যুব্জদেহ ভিখারির মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তাহলে !

মিস্টার হেস্টিংস ? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধ'রে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি, তা তোমাকে না-জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই।

ক্ষমা করেছ ?

নিশ্চয়।

দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারি সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল।

ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

স্মৃতি

হোটেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যে ঘরটিতে আমাকে থাকিতে দিয়াছে সেটিও সুন্দর। দক্ষিণ দিক খোলা, পাখাও আছে। খাওয়াও নিন্দনীয় নয়। যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিব এইখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে। কাহারও বাসায় উঠিয়া সসঙ্কোচে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। ভালই হইয়াছে। হোটেলের চাকর আসিয়া বিছানা করিয়া দিয়া গেল। বেশ চাকরটি। ছিমছাম। পরিষ্কার ফতুয়া গায়ে, মাথায় ঈষৎ টেরি। চোখমুখ হইতে বিনীত সম্ভ্রম বিকীর্ণ হইতেছে। বেশ ভাল লাগিল। মন্মথ আমাকে ভাল হোটেলই দেখিয়া দিয়াছে। নালিশ করিবার কিছু নাই। আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, শুইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়াও ঘুম কিন্তু আসিল না। মুদিত চোখের সম্মুখে বহুদিন আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

...অনেকদিন আগে একবার একটি ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেদিনকার সেই ছবিটি বারবার মনে পড়িতেছে। ভদ্রলোক স্টেশন মাস্টার ছিলেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে। স্টেশন খুব বড় নয় কিন্তু সেখান হইতে প্রচুর মাছ চালান হইত। মাছের ব্যবসা উপলক্ষেই সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানকার জেলেদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় মাছের কারবার খোলার ইচ্ছা ছিল। ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজ শেষ করিয়া পরের ট্রেনে ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু কাজ শেষ হইল না, থাকিতে হইল। কোথায় থাকা যায় চিন্তা করিতেছিলাম। জেলেদের বাড়িতে থাকিবার প্রবৃত্তি হইল না। পল্লীগ্রাম—হোটেল, ডাকবাংলো, ধর্মশালা কিছু নাই। একজন বলল—মাস্টার মশায়ের ওখানে যান না, সেখানে তো অবারিত দ্বার। গেলাম। একটু কুণ্ঠার সহিতই গেলাম। মাস্টার মশাইয়ের সহিত সকালে স্টেশনে আলাপ হইয়াছিল, মাছ চালান দিবার রেট, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি জানিতে তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম। পুষ্টকান্তি সদা-হাস্যমুখ ভদ্রলোক। মাথায় ঈষৎ টাক, প্রশান্ত প্রদীপ্ত একজোড়া চোখ, পুরুষোচিত একজোড়া গোঁফ। তখন গ্রীষ্মকাল, আপিসেও খালি গায়ে ছিলেন। এক বুক চুল, তাহার উপর ধপধপে শাদা উপবীত গুচ্ছ। টেবিলের উপর একটি টুকটুকে লাল গামছা পাট

করা আছে, প্রয়োজনের সময় তাহা দিয়াই হাতমুখ মুছিতেছেন। বাড়িতেও দেখিলাম সেই একই বেশ। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

"আসুন আসুন, আজকের ট্রেনে যাওয়া হল না বুঝি? বসুন। খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল—ওই জেলে বেটাদের ওখানে তো সুবিধে হওয়ার কথা নয়, তার চেয়ে নিমু হালুয়াই ঢের ভাল। কিছু যদি না করে থাকেন আমার এখানেই হোক না, না হয়।"

একটু ইতস্তত করিয়া শুরু করিতেছিলাম, "ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবেই। আপনার এখানে আবার এত রাত্রে"—আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া মাস্টার মশাই বলিয়া উঠিলেন, "আরে রাত আর কত হয়েছে, এই তো সবে আটটা। আমার এখানেই হোক—বলে আসি ভেতরে", আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—"গিন্নিকে কেবল একটু খবর দেওয়া যে আর চারটি চাল বেশি করে নাও। রাবণের চুলো তো জ্বলছেই দিনরাত। রেলের কয়লা, পয়সা তো লাগে না—হা—হা—হা—" চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া মাস্টার মশাই হাসিয়া উঠিলেন।

"এইবার আপনার পরিচয়টা নেওয়া যাক ভাল করে—চা খাবেন?..."

"না থাক।"

"খানই না এক কাপ, এক কাপ চা খেলে আর কি হয়? কোথা দেশ আপনার?"

'হুগলি জেলায়।"

"বাঃ, আমারও যে হুগলি..."

একটু পরেই চা আসিল। তন্নতন্ন করিয়া মাস্টার মশাই আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। এমনকি আমার শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতি গোষ্ঠীর খবর যতটা আমার জানা ছিল তাহা তাঁহাকে বলিতে হইল। হাঁটু দোলাইয়া দোলাইয়া "বেশ বেশ" বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি সব শুনিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন কোন মনোজ্ঞ কাহিনী শুনিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম ইহাই তাঁহার স্বভাব। তুচ্ছ উচ্চ যাহাই হোক মানব মাত্রেই তাঁহার প্রিয়। বহু মানুষের সঙ্গ, বহু মানুষের কাহিনী, বহু মানুষের সুখ দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার নিজের সংসারটি খুব ছোট। একটি মাত্র পুত্র, বিদেশে বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়ে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রায় কুড়ি বাইশ জন লোক খায়। টালিক্লার্কবাবুর বউ বাপের বাড়ি গিয়াছেন, তিনি মাস্টার মশাইয়ের বাসায় খান। নবাগত টিকিট কালেক্টারটির এখনও বিবাহ হয় নাই, একাই এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাস্টার মশাই আর রান্নার হাঙ্গামা করিতে দেন নাই। গঙ্গার ধারে বায়ুপরিবর্তন মানসে মাস্টার মশাইয়ের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কয়েকজন আসিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য অতিথি। আমার মতো অনাহূত লোকও প্রায়ই থাকেন দুই একজন। চাকরির আশায় গ্রামের একটি ছেলেও আসিয়াছে। স্থানীয় বাঙালীরা মিলিয়া ছোটখাটো থিয়েটার পার্টি করিয়াছেন, তাহাতে যিনি বাঁশি বাজান তিনি এখানে খান। নানা লোকের নানা পরিচয়, সকলেরই আশ্রয় এখানে। মাস্টার মশাইয়ের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, গুটিগুটি সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বংশীবাদক ভদ্রলোক (স্থানীয় একটি মাড়োয়ারির আড়তে মাস্টার মশাই তাঁহার চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন) প্রথমেই আসিলেন। ক্রমশঃ তবলা হারমোনিয়মও বাহির হইল। মাস্টার মশাইয়ের গান-বাজনার শখ আছে। গায়কেরও অভাব নাই দেখিলাম। টালিক্লার্ক, ডাক্তারবাবু, দারোগাবাবুর শালা, বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জন দুই—বেশ গাইতে পারেন।

দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। নিধুবাবু, রবিবাবু, দ্বিজবাবু, রামপ্রসাদ কেউ বাদ গেলেন না। সব রকমই হইল। রাত্রি এগারোটার মালগাড়ি 'পাস' করিয়া ছোটবাবু আসিলেন। তখন চাকর আসিয়া খবর দিল—খাবার জায়গা হয়েছে। সকলে উঠিয়া ভিতরে গেলাম। এখনও ছবিটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মাস্টার মশাইয়ের কোয়ার্টারের অপরিসর বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। ছোট বারান্দায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিতে হইল। সকলের ভাগ্যে আসনও জোটে নাই। পাট-করা সতরঞ্চি, কম্বল, বোরা প্রভৃতি দিয়া মাস্টার-গৃহিণী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন দেখিলাম। আহারও অতি সাধারণ গোছের—কলাপাতার উপর গরম ভাত, একটু ঘি, আলুভাতে, ডালভাতে, একটা সাধারণ একটু ডাল, একটু তরকারি, মাছের ঝোল, একটু অম্বল। অতি সাধারণ ভোজ্য, কিন্তু কি পরিতৃপ্তি সহকারেই সেদিন খাইয়াছিলাম। আজও ভুলিতে পারি নাই। আহারাদির পর কোথায় শোওয়া যায় তাহাও একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। মাস্টার মশাইয়ের কোয়ার্টারে স্থানাভাব। আমি ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেই মাস্টার মশাই বলিয়া উঠিলেন—"খবরদার খবরদার, ছারপোকায় খেয়ে ফেলবে, অমন কাজটি করবেন না। দেখুন না এইখানেই হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। গোটা দুই বেঞ্চি আছে—তাই জুড়েই করে দিচ্ছি দেখুন না।" বাইরের বারান্দায় দুইখানি বেঞ্চি জুড়িয়া মাস্টার মশাই নিজে দাঁড়াইয়া আমার বিছানা করাইয়া দিলেন। স্থানে-অস্থানে পেরেক ঠুকিয়া একটা হাওড়ার হাটের শতচ্ছিন্ন মশারিও টাঙানো হইল।

...সেদিন আহার শয্যা কিছুই ভাল ছিল না, কিন্তু এক ঘুমে রাত কাটিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন হইতে মাস্টার মশাই আমার আপন লোক হইয়া গিয়াছিলেন।

...মাস্টার মশাইয়ের সম্বন্ধে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একবার মনে আছে শীতকালে গিয়াছিলাম। ট্রেনটা খুব ভোরে পৌঁছিত। ট্রেন হইতে নামিয়া দেখি অভূতপূর্ব ব্যাপার। স্টেশন প্লাটফর্মের এক কোণে চায়ের একটা স্টল গোছের হইয়াছে। অনেকেই চা পান করিতেছেন। পুলকিত চিত্তে আমিও আগাইয়া গেলাম। শীতকালের ভোরে এখানে চা পাইব আশাই করি নাই। চমৎকার চা। চা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাম কত?"

"দাম লাগবে না বাবু।"

"দাম লাগবে না! সে কি!"

"মাস্টারবাবু মোসাফিরদের রোজ মাংনিতে পিলান"—এই অদ্ভুত আধাবাংলা আধাহিন্দিতে যে লোকটা জবাব দিল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম সে স্টেশনেরই কুলি একজন। অবাক হইয়া গেলাম। সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের মাস্টার মশাই বিনা পয়সায় চা খাওয়াইতেছেন। মাস্টার মশাইয়ের সহিত একটু পরেই দেখা হইল।

"চায়ের সদাব্রত খুলেছেন, ব্যাপারটা কি?"

দরাজ গলায় মাস্টার মশাই হাসিয়া উঠিলেন।

"আমার সে সামর্থ্য কি আছে ভাই? একজন টি মার্চেন্ট এক 'কেস' চা এমনিই দিয়েছিল। ভাবলাম একা খাই কেন, পাঁচজনে মিলে খাওয়া যাক। গণেশ মাড়োয়ারিকে বলাতে চিনিও পাঠিয়ে দিলে কিছু। ঘরের গায়ের দুধ—দুটো গরুতে সের আষ্টেক দিচ্ছে আজকাল। আর রেলের কয়লা, রাবণের চুলো দিনরাত জ্বলছে। জংশন থেকে একটা বড় কেৎলি আর কিছু কাপ আনিয়ে নিয়েছি। ঝক্‌সুর ভোরে ডিউটি—তাকে বললাম তুইও খা পাঁচজনকেও খাওয়া। বাস, মিটে গেল—"

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মাস্টার মশাইয়ের উপর জোর জবরদস্তি করিতে কাহারও বাধিত না। লাইনের সকলের তিনি 'দাদা' ছিলেন। আর একবারের আর একটা ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। শীতকালে প্রচুর মাছ চালান হইত, প্রত্যেক জেলেই মাস্টার মশাইকে মৎস্য উপঢৌকন দিত। মাস্টার মশাই নিজের জন্য কিছু রাখিয়া বাকিটা বিতরণ করিতেন। ডাক্তারবাবু, দারোগা, পোস্টমাস্টার প্রভৃতিকে তো দিতেনই, বেশি হইলে পরের স্টেশনের বাবুদেরও পাঠাইয়া দিতেন। একবার মাছ বেশি হয় নাই। চালান কম। পরের স্টেশনে পাঠাইবার মতো প্রচুর মাছ একদিনও জোটে নাই। হঠাৎ একদিন মাস্টার মশাইয়ের নামে একটা প্রকাণ্ড পার্শ্বেল আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। আমি তখন সেখানে উপস্থিত। বাক্সটা খুলিতেই দুইটা বিড়াল লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাক্সে একখানা চিঠি ছিল। পরের স্টেশনের বাবুরা লিখিতেছেন—"দাদা, বিড়াল দুইটাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা অন্তত আপনার পাতের কাঁটা চিবাইয়া বাঁচুক।"

"দেখেছ, দেখেছ, ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড দেখেছ—"

মাস্টার মশাইয়ের চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। তখনই বাজার হইতে কিছু মাছ কিনিয়া পরের ট্রেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এমনই কত ঘটনা...।

কলিকাতায় নিজের কাজেই আসিয়াছিলাম। হাওড়া স্টেশন হইতে সোজা হয়তো বড়বাজারের সেই হোটেলটাতেই উঠিতাম। হাওড়া স্টেশনেই পূর্বপরিচিত একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহারই মুখে শুনিলাম মন্মথ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, ভাল চাকরি পাইয়াছে, একটা ঠিকানাও আমাকে দিল। অনেকদিন মন্মথকে দেখি নাই একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল, হাওড়া হইতে সোজা তাহার বাসাতেই গেলাম। বাড়িটি বেশ সুন্দর।—আমি বারান্দায় উঠিতেই একটি বালক-ভৃত্য আগাইয়া আসিল।

"কি চান আপনি?"

"মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বল—"

বালকটি আমার কথা শেষ করিতে দিল না। ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটি শ্লেট পেন্সিল আনিয়া বলিল—"আপনার নাম আর কেন দেখা করতে এসেছেন তা এতে লিখে দিন—"

লিখিয়া দিলাম। বালক-ভৃত্যটি ড্রইং রুম খুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন এখানে..."

বসিলাম। সোফা সেটটিতে সাজানো ড্রইং রুমটিও বেশ সুন্দর। সুরুচির পরিচয় দিতেছে। প্রায় মিনিট দশেক পরে মন্মথ বাহির হইল। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে চিনিতে পারিতাম না। ঢিলা পায়জামা পরা, বাটারফ্লাই গোঁফ। আশা করিয়াছিলাম প্রণাম করিবে, কিন্তু করিল না। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"ও আপনি এসেছেন—"

"অনেকদিন দেখি নি। ভাবলাম—"

"বেশ করেছেন। উঠেছেন কোথায়—"

"কোথাও উঠি নি এখনও। হাওড়া স্টেশনে বেচুলালের সঙ্গে দেখা, সে-ই তোমার খবর আর ঠিকানা দিল। সোজা এখানেই চলে এলাম..."

মন্মথ হাতঘড়িটা একবার দেখিল। তাহার পর বলিল—"আমার বাসায় আজ মোটে জায়গা নেই। একে ছোট বাসা, তার উপর আমার শালী ভায়রাভাই সবাই এসেছেন। চলুন আপনার থাকবার জায়গা একটা ঠিক করে ফেলা যাক আগে। বেশি রাত হয়ে গেলে হোটেলেও জায়গা পাওয়া যাবে না। যা লোকের ভিড় আজকাল কোলকাতায়—" অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ উক্তিতে রাগ করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে তাহার সোফা সেটটি সরাইয়া ওই ড্রইং রুমে আমার শুইবার একটু স্থান কি করিয়া দিতে পারিত না?

আপনারা হয়তো বলিবেন এমন অসঙ্গত প্রত্যাশা আপনি করেন কেন? করিতাম না যদি এই মন্মথ সেই মাস্টার মশাইয়ের ছেলে না হইত।

অর্জুন মণ্ডল

এক

কড়া নাড়ার শব্দে বসলাম। শীতকালে এত রাত্রে কে এল আবার?

কে?

আমি, আমি—কপাট খোল।

খুললাম। সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বাললাম। দেখি, খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা, সামনে গোটা-দুই দাঁত নেই।

আমার চিঠি পাও নি নিশ্চয়?

না।

চিতুয়া পোস্ট করে নি তাহলে? শালা ডাকু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হত, তাকে দেওয়াই ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল—এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

অর্জুনকাকা! হঠাৎ এত রাত্রে কোথা থেকে?

তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরের জিনিশপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধহয়। আমার ধারণা ছিল, চিঠি পেয়েছ তুমি।

না, না তার জন্যে কী হয়েছে—

হয় নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এইসব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কিনা—

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা', 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়তো।

না, ও–কথা মানব না আমি।

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেমে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন।

কেন ওকে বেশি পয়সা দিতে যাব মিছামিছি।

'মিছামিছি'ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব।

দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তাহলে।

চাকরকেই বা ডাকবে কেন? আমার গায়ে জোর নাই নাকি?

অবলীলাক্রমে নামিয়ে ফেললেন সব! বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তিমাফিক গাড়োয়ানকে পাই–পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, কোন ঘরটায় শুব?

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল। সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন, যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।

আপনার খাওয়াদাওয়া?

রাত্রে আমি কিছুই খাই না।

দু–চারখানা লুচি–টুচি ভেজে দিক না, কী আর এমন রাত হয়েছে?

বিছানা পাততে–পাততে অর্জুনকাকা বললেন, তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি?

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি, বুঝলে?

ও।

নিজেই ভুগবে শালা। আমার কী!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাও, আর রাত করো না, শুয়ে পড়।

সত্যিই কিছু খাবেন না?

দেখ, বেশি যদি পীড়াপীড়ি কর, বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন প্লাটফর্মে চলে যাব তাহলে।

বুঝলাম, অর্জুনকাকা বদলান নি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা, আশ্চর্য জীবন লোকটার! স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এদেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন। আমাদের বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চিৎকার চেঁচামেচি কলরব আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল, তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কী যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন।

তাঁর বগলে একটা রুইমাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কী কেড়ে নিচ্ছে? কারা?

জমিদারের সিপাহিরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছুকিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরিব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

আচ্ছা, তুমি চুপ করে ব'স এইখানে।

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এককোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহি দু'জনও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা?

এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই চাহিয়ে!

নেহি দেগা—কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহিদের চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে বাবাকে ইতর-ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহিরা আত্মসম্বরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহিদের বললেন, আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বলো না এখন!

সিপাহিরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেশাই এরকম করে থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অতবড় দুর্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তারবাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো! উহ্ বিদ্যার কী প্রতাপ! কী হবে পয়সায়, কী হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল, অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন-সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন, আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।

কী বল?

আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই! আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

এইবার বাবার তাক লাগল।

তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?

আমার স্ত্রী। আমার জমিজমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে—চলে যাবে কোনোরকমে। আমিও রোজগার করব কিছু।

কটি ছেলেপিলে তোমার?

সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই।

বাবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জ্বলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সংবরণ করতে হল তাঁকে।

পড়াশোনা করবে, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু করবে কী করে? স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়—

নেবে না?

এ বয়সে কি আর স্কুলে নেয়!

তবু আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন, তাহলে হয়।

কী করব বল?

আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আমি ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদের পুরনো বই-টই নিয়ে—

বাবা একটু চুপ করে রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতেও পারলেন না, অথচ এরকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর। একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, বেশ, পার তো আমার আপত্তি কী!

তার পরদিন বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে দেখতে ছোট কুঁড়েঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, আর সেইদিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাস্টারমশাই পড়াতেন, তিনিই অর্জুনকাকার অক্ষরপরিচয় করিয়ে হাতেখড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফার্স্টবুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন—এত ভোরে যে, আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম, তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন! মজুরের কাজ করে বেড়াতেন দিনের বেলায়। যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন। ফিরতেন বিকেলে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়াদাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না! দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল, ছাতু খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জ্বেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির তেলের বেশবড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে-পড়াটা পড়তেন, তা আমরা দেখতে পেতাম না কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যেভাবে পড়তেন, তার থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শিরদাঁড়া একটু বেঁকতে দেখি নি। টেবিল চেয়ার ছিল না, আমাদের মতো চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি, উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তাতেই একটি ছোট ইটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন-কাঠের বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেলফ। নিচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কী সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে! খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমার পেন্সিল-কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কী সুন্দর মলাট দিতেন!

কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জ্বেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয়,

মশাও পালাত। এক ঘটি চা খেতেন তিনি—এক-আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সরষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাশ ঠাশ করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মতো বয়স হয় নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি, পুরাকালে শিক্ষার্থী যেমন গুরুগৃহে বাস করে অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ওরকম নিষ্ঠা আর কোথাও দেখি নি। মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু-এক দিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়েঘরে বসে। এইভাবে বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় 'সীতার বনবাস' এবং ইংরেজিতে 'রয়েল রিডার নম্বর ফোর' পর্যন্ত পড়ে ফেললেন তিনি, আরও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মূলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এইভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে সব ওলটপালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধেবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না সাহেব। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাত হালকা নয়। অর্জুনকাকা নিজের কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময় তিনি বসে বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে বললেন—Yes sir, I shall carry your things most gladly. অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরেজি শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নামাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন—Thank you sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you.

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন, Why?

You are Doctor Babu's honoured guest.

সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নামিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, ও যদি চায়, আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউন্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ জোগাড় করে দেব।

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন, একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলেছিলেন, হঠাৎ বাধা পেয়ে এবং সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাকে ড্রেসার হতে বলেছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কী।) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি, তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখেমুখে।

ইতিপূর্বে তাঁর মুখের এরকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ করেছিলাম আমি; অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন, আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ করতাম। তাঁর মুখের এরকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশি অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখমুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হত জিভটা যেন চিবুচ্ছেন—নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘন ঘন চিবুতেন মনে হত। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটিসহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যেসব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তার সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধহয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাঙচাতেন। হয়তো কথঞ্চিৎ শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, কাল থেকে ঘা ধোয়াব ! সে কী। তিন-তিনখানা ডিকশনারি আনতে দিয়েছি আমি—

অত ডিকশনারি কী হবে ?

মুখস্থ করব।

মুখস্থ করবে ? কী হবে ডিকশনারি মুখস্থ করে ? তাছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কী, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।

দেবে না ? কেন ?

এই নিয়ম। প্রাইভেটলি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা—তাও তিন বছর চাকরি করার পর।

অর্জুনকাকা বললেন, শুনেছি হাই স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।

তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভরতি হতে হবে। আই. এ. পাস করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কী? তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়। কম্পাউন্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা।

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন !

পরদিন থেকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিয়ার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যান্ডেজ পাকাতে হয় কী করে। করিম মিয়ার খুব সুবিধে হল। ছাপোষা লোক তিনি। মুরগি ছাগল, গোটা-দুই বিবি এবং গোটা-বারো ছেলেমেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে, হাসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাগরেদ পেয়ে বেঁচে গেলেন

তিনি। অর্জুনকাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যান্ডেজ পাকানো, ছুরি কাঁচি পরিষ্কার, খাতায় রুল টানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউন্ডার হারাধনবাবুও প্র্যাকটিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন অল্প কিছুদিন পরে। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতেন সেগুলি। এমনকি বাবার হয়ে রিটার্নও করে দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল।

অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন মঞ্জুর করেছিলেন, যদিও তা সামান্যই, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেন নি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাংলায় বসুমতী সংস্করণের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক গ্রন্থাবলিই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজিতে রবিনসন ক্রুসো, গ্যালিভার্স ট্রাভলস, পিলগ্রিমস প্রগ্রেস জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিকশনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হল ড্রেসারিবিষয়ক জ্ঞান আহরণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি বই। কিন্তু ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যেসব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে।

এতে কিন্তু ফল শেষপর্যন্ত ভালো হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক। তিনি এতবড় একজন দিগগজকে পরীক্ষার্থীরূপে পাবেন আশা করেন নি। কোনো-কোনো বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশি—এটা বরদাশত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যান্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা, অসুবিধা তন্নতন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশি কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি।

ফেল হয়ে অর্জুনকাকা যেদিন ফিরে এলেন, সেদিনও ওইরকম মুখভাব দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তাঁর বিরুদ্ধে আক্রোশ—এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠেছে, চালে গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিতভাবে ভ্যাঙচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র। পরদিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ উদ্যমে। যেন কিছুই হয় নি।

পরের বার পাস করলেন। কম্পাউন্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউন্ডারি পড়বার জন্য কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে? দিনকয়েকের ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে-খবর দিলেন তা অভাবনীয়।

পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল এক ঘর। বেশ ভালো অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারি আছে। তাঁর সাত ছেলে। তিনি নাকি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান।

হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

এ এক মহা আফৎ হল!

অর্জুনকাকা 'আপদ'কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বলতেন, আমার তো মনে হচ্ছে ভালোই হল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখে থাকবে। ওরা বড়লোক—

বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাশ, চোর, লম্পট, লুচ্যা—

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

আপনি তো সব জানেন ডাক্তারবাবু। এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কী হয়েছিল—আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা।

সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভালো।

আপনি বলছেন?

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি।

বাবা বললেন, তোমাদের মেয়েদের যদি বিয়ে না দাও, তাহলে কার কাছে রেখে যাবে এদের? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।

তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।

তোমার যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো।—এই বলে বাবা উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখদুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিভটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তার জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গরিব মানুষ, বেশি বরযাত্রীর হাঙ্গামা বরদাশত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশি বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল, পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রামশিঙে, পনেরটা কাঁসি এবং দশটা শানাই সমভিব্যাহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হল শেষপর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেন নি; তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে করে এনেছিলেন। অর্জুনকাকার

বাড়ির সামনের মাঠে তাঁর প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছিল। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশি হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হয়ে চুপ করে রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জনে মুখভঙ্গি করে নিজেই নিজেকে ভেঙচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এরপর বছর-দুই অর্জুনকাকার কোনো খবর পাই নি। মাইনর পাশ করে আমরা শহরের হাইস্কুলে গিয়ে ভরতি হলাম। অর্জুনকাকা কটকে কম্পাউন্ডারি পড়ছেন, এইটুকু শুধু জানলাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম, অর্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর-দুই পরে অর্জুনকাকা হঠাৎ হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভরতি করে দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন, আমরা যেন একটু দেখাশুনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, বলছি বটে, কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসি—

মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। পরের ট্রেনেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিঙে থাকতাম। অর্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া করে রইল। সঙ্গে এল পিসি। তিনিই হলেন গার্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ, দই, মাছ, ঘি, আম, কাঁঠাল সরবরাহ হতে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনিহারি দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জুনকাকার জামাইদের নিত্যনূতন সাজসজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনকাকা যা বলেছিলেন, শেষপর্যন্ত তাই হল। অর্থাৎ আবার শুনলাম, অর্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এসে গো-বেড়েন করছেন প্রত্যেকটি জামাইকে। বেচারাদের আর্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে নাকি! দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় ভাঙা আয়না, চিরুনি, স্নো, পাউডার, সিগারেট-বাক্স, কয়েকটা শৌখিন জামা, শাল প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানালা ছিল.। উঁকি দিয়ে দেখি, অর্জুনকাকা। পিছনে দু'হাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিভ চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপি চুপি সরে পড়লাম। অর্জুনকাকা সেই দিনই চলে গেলেন। তার পরদিন জামাইরাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইদের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জুনকাকার, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিয়েছেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলেজে ভরতি হলাম। তারপর আই. এস-সি. পাশ করে গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকার খবর অনেক দিন পাই নি। এইটুকু শুনেছিলাম যে, তিনি কম্পাউন্ডারি পাশ করে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি করে বেড়াচ্ছেন। এবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম, অর্জুনকাকা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার জন্যেই বিশেষ করে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মোকোলজি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে চান।

তুমি তো পড়ছ এসব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার সাধ্য আমার ছিল না। একবার শুধু ইতস্তত করে বললাম, এখন আর কী করবেন এসব পড়ে?

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা।

কী করব? বাহ্!

একটু থেমে তারপর বললেন, শিখব। শিখতে দোষ কি আছে? তাছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর। প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভালো করে শিখিয়ে দাও তুমি।

যতদিন বাড়িতে ছিলাম, অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হত। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হত আমার। ওই বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারটায় শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা নাছোড়। রোজ ডাকাডাকি করে ঠিক তুলতেন আমাকে। কেবল দুপুরটা ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময়ে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিয়ে দিতেন ভিতর থেকে। আমি মনে করতাম, ঘুমনো বোধ হয়। একদিন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পিছনে দু'হাত রেখে পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিভ চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা, ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে। হাতে ছোট আয়নাখানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরছেন মুখের সামনে আর ভ্যাঙচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় বড় স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখানা—'অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মোকোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজবোধ্য ইংরেজি ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পার, অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দাও।' যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার মেসে এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ–সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন, এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভালো স্কুলে ভরতি করব বলে এনেছি। ওখানে কিছু হবে না। তুমি একটা ভালো স্কুল বেছে দাও। শুনেছি, মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয়?

কী হবে অত কড়া শাসনে রেখে?

তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিচ্ছু হবে না।

তারপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন, হেঁ –হেঁ, এসব দৈত্য নহে তেমন—

চকিতের মধ্যে মুখের পেশিগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল জিভটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম তোমার?

চিতুয়া।

অর্জুনকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

'চিত্তরঞ্জন' বলতে পার না?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, এমন অসভ্য এরা, ভালো একটা নাম রাখলাম চিত্তরঞ্জন, সে নামকে করে ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে—চিতুয়া, চিতুয়া! চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়ে বাহিরই হয় না, কী করবে বেচারা।

অর্জুনকাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভরতি করে দিলাম।

মর্টনের উপরেই অর্জুনকাকার ঝোঁক বেশি ছিল, কিন্তু আমি মানা করাতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, টাকার কোনো অভাব হবে না। এর বাবা না দেয় আমি দিব, কিন্তু পড়াশুনার ভালো ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে, সেইটি দেখো।

আমি যতদিন কলকাতায় ছিলাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লৌহকণা আকর্ষণ করে, চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার চারদিকে। ক্লাস প্রমোশন অবশ্য পেলে, কিন্তু নিজের জোরে নয়, আমার তদবিরে।

...এর পর অর্জুনকাকার যে-স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভালো ডাক্তার হতে হলে এখানকার ডিগ্রিই যে পর্যাপ্ত নয়—এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রি লাগাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেত পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না'ও বলতে পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন।

এমন সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন, আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না। এইসব নিয়ে বাড়িতে আলাপ-আলোচনা চলছে, হঠাৎ অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারির নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতনই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, বিয়ে করে বিলেত যাও না, ভালোই তো! শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন?

ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।

বাহ্!

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, বিলেত যেতে কত টাকা লাগে?

পাঁচ-ছ হাজার।

মোটে? আমি দিব তোমাকে টাকা।

আপনি?

হাঁ, ছ হাজার টাকা পোস্ট-অফিসে আছে আমার। কালই বাহির করে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না।

চুপ করে রইলাম।

কাল তাহলে টাকাটা বাহির করি?

না, থাক্।

কেন, আপত্তি করছ কেন?

থাক্ না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয় নি এখনও।

হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তাছাড়া ওদের টাকার অভাব কী? ওদের আমি দিব না কিছু। তুমিই নাও, ভালো কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার। কী বল, বাহির করি? অর্জুনকাকার চোখের আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

না, থাক্।

কেন, আমাকে পর ভাবছ?

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি, তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তরদিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা অবর্ণনীয়! আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও সরে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরেই একটা জাহাজের চাকরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই। অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। দেখা হল বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ এক রাত্রে এসে হাজির। কিন্তু সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নিচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়োবাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজের হাতে উনুন আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলিতি ডিগ্রি সত্ত্বেও চাকরি পাই নি, প্রাকটিসও জমাতে পারি না। কোটিপতি হবার আশায় কলকাতা শহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয় নি। এখন এই মফস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় এক জায়গায় যেতে হবে, তার আগে হাতে কোনো কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড় গামছা।

অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন? চাকরটাকে বললেই সে বাথরুম দেখিয়ে দিত—

কষ্টটা আর কী! এতেই অভ্যস্ত আমি।

ভিজে কাপড় গামছা জানালার গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতেই জ্বলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়।

বারান্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো?

না। উনুন দিয়ে কী করবেন?

দেখ না—! বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তাতে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপর বসে গা হাত পা সেঁকতে লাগলেন।

তুমি সরে এসে ব'স না। সোয়েটারই পরো আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।

অর্জুনকাকা হাত গরম করে করে দুই গালে দিতে লাগলেন। দু-পা ফাঁক করে উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু-একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুনকাকার সঙ্গে যে আমার কী সম্পর্ক, তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে একনজর চেয়ে বুঝলাম, সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুনকাকা সবিস্ময়ে বললেন, এসব কী?

একটু চা খান।

আমার কথা ভুলে গিয়েছ দেখছি।

চা তো আপনি খেতেন।

চা তো খাবই, ওই জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বল। আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমারটাই খাব আজ। শৌখিন পেয়ালার এক-আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার।

বেশ তো, বেশি করেই খান না।

আমি নিজের হাতে করব—নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।

খাবার-টাবারগুলো?

আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জানো। আগে দই চিঁড়া খেতাম, এখন তাও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তাও নিরামিষ।

এত খাবার কী হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—

বেশ আমিই তোমাদের দিচ্ছি। খাও, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাকো। ছেলেপিলে কটি তোমার?

একটিও হয় নি এখনও।

কেন?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্মনিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি, তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, তুমি এসব নিয়ে যাও। মাকে বল, কিছু চা চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে, তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি।

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন, এ চা ভালো নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে।

একটু লজ্জিত হলাম। সত্যিকথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায় নি—অর্থাভাবে শস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতে পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো।

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ একটি বড় গ্লাস বার করলেন। একটি পিতলের ছাকনিও। চা তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাস নিলেন। চা খেতে-খেতে নিজের কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনাও হয় নি তাঁর। নাতিও মনের মতো হয় নি। স্ত্রী মারা গেছেন। প্র্যাকটিস করতেও আর ভালো লাগে না। দুনিয়ার কারো সঙ্গে বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।

তোমার প্র্যাকটিস হচ্ছে কেমন?

চলে যাচ্ছে।

হবে, তোমার ঠিক হবে। আমগাছে আমই ফলবে।—খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। আচ্ছা, তুমি ব'স। আমি বাজারটা ঘুরে আসি।

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও রোগী দেখতে বেরুলাম।

যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটা। ফিরে দেখি, অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় অর্জুনকাকা বসে আছেন।

খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা।

কী?

দেখবে? চল না, কাছেই।

বলুন-না কী?

না-দেখলে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটের পথ, চল না।

যেতেই হল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহার দোকানে।

ওই দেখ।

কী?

বিস্ময়কর কিছু দেখতে না-পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

লোহার চাদরটা দেখছ না! হাত দিয়ে দেখ কত মোটা—

কোট-প্যান্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হল, তবু অর্জুনকাকার আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

ভালো নয়?

হ্যাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে।

পুরুই দরকার।

কী করবেন এ নিয়ে?

উনুন—চমৎকার উনুন হবে এতে। তোমার জন্যও একটা করতে দি, কী বল?

দিন।

উনুনের দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুনকাকাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলাম না। অর্জুনকাকা সোৎসাহে আরও খানিকটা লোহার চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারের ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন, আর একটা উনুনও করতে হবে। বেশ ভালো মজবুত করে বুঝলে?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, বাজারে যে তৈরি তোলাউনুন পাওয়া যায়, সেসব বড় অমজবুত। এ দেখো, কীরকম হবে—

ফিরবার পথে বললেন, এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি।

তার পরদিন শুধু কাঁঠাল কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটা, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হল। অর্জুনকাকা সোৎসাহে সিন্দুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, সিন্দুকটা এমনভাবে করাব, যাতে আমার কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানাপত্তর, খাওয়াদাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু-একখানা, বই-টই—পাঁচটা পুঁটুলি করে আর কী হবে! আমার ক'টা জিনিসই বা আছে। একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি—কী বল?

বেশ তো।

উঠেপড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলল।

ভালো করে র‍্যাদা দাও না, ওর নাম কি র‍্যাদা দেওয়া বার্নিশ হবে, ও কী করছ তুমি?

একটু ভালো করে খেটে-খুটে কর বাবা, মজুরি ছাড়া বকশিশও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না—

হ্যাঁ, ঠিক করে মেপে নাও—থামো থামো, আমি ধরছি—

আরে বাবা, কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ, চারটে।

হাঁ-হাঁ-হাঁ, প্যাঁচ কষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—

—এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুনকাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তিক্লান্তিহীন। জলের মতো পয়সাও খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিলটন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতরে আস্তর দিলেন। যত খরচই হোক, জিনিসটা মনোমতো করতে হয়। জীবনে কোনো জিনিসই মনোমতো হয় নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি-যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন, এই সান্ত্বনাটুকু আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ যেন সিন্দুকটার ওপর প্রয়োগ করেছেন তাই।

সিন্দুকটা হলও চমৎকার! যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।

অর্জুনকাকা বললেন, এর উপর লাফাও তুমি।

কেন?

দেখ কত মজবুত! আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি।

অনিচ্ছাসহকারেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

পা ঠুকো।

পা ঠুকলাম দু-একবার। খুব মজবুত হয়েছে।

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উনুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটাদুই তালা কিনলেন ভালো দেখে।

...ক্রমশ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারলে না। দু'জন লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গড়িয়ে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পরলে না। সিন্দুকটা এত বেশি বড় হয়েছিল যে ট্রেনের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেস নিয়ে কত লোক উঠল নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুনকাকা উঠতে পারলেন না; ট্রেন ছেড়ে গেল।

...অর্জুনকাকার দিকে চেয়ে দেখলাম—তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল, ঘনঘন জিভ চিবুচ্ছেন তিনি।

অহঙ্কার পাঁড়ে

অহঙ্কার পাঁড়ে একবার খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। একাধিকবার হওয়ার কথা, আমি একবারের খবরটা জানি।

অহঙ্কার পাঁড়েকে চেনেন আপনারা? খুব সম্ভব চেনেন না। কারণ অহঙ্কার পাঁড়ে নামে তিনি পরিচিত নন। বিনয়কুমার ভদ্র, সুশোভন মিত্র, সুব্রত দাস বা ওই ধরনের কোনও একটা মোলায়েম নামের লেফাফায় আবৃত হয়ে তিনি সমাজে বিচরণ করেন। আমি কিন্তু জানি তাঁর নাম অহঙ্কার পাঁড়ে। আপনারা হয়তো দেখেছেন তার গোঁফ-কামানো, নাপিত-লালিত মুখখানি, আমি কিন্তু তাঁর উদগ্র গোঁফ-জোড়া দেখেছি মহিষের শিঙের মতো উঁচিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে। নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত দেখেছি তাঁকে। বর্তমান আখ্যায়িকায় তিনি একজন সমালোচক। ফ্রী লান্স্—খাপখোলা তলোয়ার একেবারে। সাহিত্য রাজনীতি বাজারদর প্রতিবেশী ফেরিওলা শিক্ষা সমাজ প্রত্যেককে কেন্দ্র করেই ওষ্ঠপ্রান্ত ফেনায়িত হয় তাঁর। অহঙ্কার পাঁড়ের সমালোচনা-এলাকার পরিধি বহুবিস্তৃত।

কারও সমালোচনা-বাতিক যদি আইনের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তা হলে অনাত্মীয় ব্যক্তিদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়। দূরদর্শী মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের অবশ্য একটু চিন্তা হতে পারে; কারণ যে ব্যক্তি ঠিক সীমারেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তার সীমারেখা অতিক্রম করতে দেরি লাগে না। আর অতিক্রম করলেই বিপদ। পাগলা-গারদে রাখবার খরচ আজকাল প্রচুর, বিনা পয়সায় রাখতে চায় না আজকাল। অনাত্মীয় ব্যক্তিদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়, কিন্তু পৃথিবীতে এসব ব্যাপারে অনাত্মীয় ব্যক্তিদেরই ধর্ম-প্রবণতা একটু বেশি। আজকালকার বাজারে ফুলকো লুচি, মোহনভোগ খুব সুলভ নয়, তবু কিন্তু আর সহ্য করতে পারছিলেন না তাঁরা। অহঙ্কার পাঁড়ের বাগবিস্ফোরণে আকৃষ্ট হয়ে যদি পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষেরা আকৃষ্ট হতেন তা হলে অনাত্মীয়ের দলও রেহাই পেত। কিন্তু তা তাঁরা হন নি। লোকটা এখনও ছাড়া রয়েছে।

প্রধান মুশকিল, অধিকাংশ লোকই অহঙ্কার পাঁড়েকে চিনতে পারে না প্রথমে। বিনয়কুমার বা ওই ধরনের কিছু একটা ভেবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যায়। তারপর ইট খেয়ে পালিয়ে আসে। অহঙ্কার পাঁড়ের দু' হাতে এবং চার পকেটে যে অনেক ইট মজুত থাকে সর্বদা, এ-খবরও অনেকে জানে না। কারণ ইটগুলোও অদৃশ্য। অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যখন নাকে বা রগে লাগে তখন চমকে যেতে হয়।

শুধু সমালোচনা করেই যদি অহঙ্কার পাঁড়ে নিরস্ত থাকতেন তা হলেও তত গোল হ'ত না। কিন্তু তা তিনি থাকতে চান না। তিনি তাঁর সমালোচনা শোনবার জন্যে একটি ভক্তমণ্ডলীও চান। ফুলকো লুচি, মোহনভোগ, ভাল চায়ের আয়োজন করেছেন প্রচুর। ভক্তমণ্ডলী পেয়েছেনও। এমনকি তাঁর বৈঠকখানায় স্থানাভাবও ঘটে প্রায় প্রত্যহ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুচি মোহনভোগ খেতে খেতে অহঙ্কার পাঁড়ের বক্তৃতা শুনছেন এ রকম ভক্তও দেখেছি আমি স্বচক্ষে। অহঙ্কার পাঁড়ের বক্তৃতায় সায় দেওয়া খুব যে একটা অসম্ভব ব্যাপার তা নয়। হাসি চাপবার একটু ক্ষমতা থাকলেই হল।

তিনি হয়তো বললেন—"দেখুন, আকাশের সম্বন্ধে একটা বড় কথা আবিষ্কার করেছি।"

উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে উঠলেন সবাই।

স্পর্ধিত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অহঙ্কার পাঁড়ে খানিকক্ষণ। ভাবটা যেন—আমার আবিষ্কারত্বে সন্দেহ প্রকাশ করবার সাহস তোমাদের আছে নাকি? যদি থাকে—

সকলেই জানেন, এ অবস্থায় চুপ করে থাকাটাই সঙ্গত। অহঙ্কার পাঁড়ে তখন বললেন—"জানেন সেটা কি?"

প্রায় সমস্বরে—"না।"

"আন্দাজ করুন।"

নানা ভঙ্গিতে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন সকলে এবং ব্যর্থকাম হলেন।

একজন মাথা চুলকে মৃদু হেসে শ্রদ্ধাগদগদ কণ্ঠে বললেন—"আপনিই বলুন।"

অহঙ্কার পাঁড়ে বললেন—"আকাশ নীল।"

এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু কেবলমাত্র মুচকি হাসির সায় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবার লোক অহঙ্কার পাঁড়ে নন। তিনি দাবি করেন তিনি আকাশকে যে নীল দেখছেন তার মধ্যে অনন্যতা আছে। তিনি যা যা দেখছেন তা আর কেউ দেখে নি। তাঁর বক্তব্য—"আমি শুধু আকাশ দেখছি না, আমি শুধু নীল দেখছি না, আকাশ নীল বলতে আপনারা যে বাহ্য-রূপটা বোঝেন তা-ও দেখছি না আমি। আকাশের নিগূঢ় সত্তা যাকে আমি আকাশত্ব আখ্যা দিতে চাই এবং নীলের অন্য-বর্ণ-সম্পর্কহীনতা যাকে আমি নীলত্ব নামে অভিহিত করতে চাই—এই উভয় বৈশিষ্ট্যের রহস্যময় যোগাযোগ আমার মর্মচেতনায় যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করছে তাই আমি প্রত্যক্ষ করছি রস-পরকলা-যোগে।"

সুতরাং তিনি চান এ জন্য সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে বাহ্‌বা বাহ্‌বা করতে থাকুক। বাহ্‌বা বাহ্‌বা করতে বাধ্য তারা। তাঁকে প্রত্যেক শিল্প-সভায়, সাহিত্য-সভায়, গণ-সভায়, জন-সভায়, সাংস্কৃতিক সভায়, সভাপতি করতে হবে। তাঁর নাম হাততালিতে বাজবে, রেডিওতে বাজাবে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তম্ভে। সমাজকে উঠতে বসতে হবে তাঁর কথায় কথায়। তিনি নীলকে নীল, সবুজকে সবুজ বলেছেন, এ কি সোজা কথা? এ জন্য নীলের এবং সবুজেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাঁর কাছে। নীলের সত্যরূপ চিনতে পারে ক'টা লোক। সবুজকে সবুজ বলবার মতো বুকের পাটা ক'জনের আছে?

লুচি-লুব্ধ কয়েকটা ছোঁড়ার প্রশংসায় কেন সন্তুষ্ট থাকবেন তিনি। দেশসুদ্ধ সবাই তাঁকে ঘিরে বাহবা-কীর্তন করবে না কেন? কেন-কেন-কেন?

নিদারুণ পরিস্থিতি। এহেন গুণী লোককে চিনতে বাংলাদেশের লোকেরও দেরি হয়। তারা হুজুকে। গান্ধী জওহরলাল নিয়েই মত্ত, অহঙ্কার পাঁড়ের দিকে চাইবার অবসর হল না তাদের।

মোহনভোগখোর কয়েকটা ছোঁড়া ছাড়া আর কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না।

...নিরুদ্ধ আক্রোশে কিছুদিন চুপ করে রইলেন অহঙ্কার পাঁড়ে। তারপর তাঁর সমালোচনায় বাজল নতুন সুর। বাহবা-বিরোধী হয়ে উঠলেন তিনি। কেউ কাউকে বাহ্‌বা দিলেই ক্ষেপে উঠতেন। রক্তচক্ষু বিস্ফারিত নাসা মুক্ত-কচ্ছ হয়ে যেসব কাণ্ড করতেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বুক চাপড়াতেন, চুল ছিঁড়তেন, মুখ-বিকৃতি করতেন। লম্ফ দিয়ে ক্রমাগত বলতেন—"ছোটলোক ছোটলোক; ছোটলোক হয়ে গেছে সব!"

দূরদর্শী মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের হৃৎকম্প হত।

পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষেরা অহঙ্কার পাঁড়েদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও আর এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা এঁদের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁরা শিল্পী,—ছবির বিষয় খুঁজে বেড়ান যাঁরা।

একদিন একজন শিল্পী অহঙ্কার পাঁড়ের কাছে এসে সবিনয়ে নিবেদন করলে, "আপনার একটি ছবি আঁকব আমি। দেবেন আঁকতে?"

"আমি ছবি! আমার ছবি এঁকে কি হবে! সতু ঘোষের ছবি আঁকুন, নাম হয়েছে তার ফুটবল খেলায়। আমি সামান্য মানুষ।"

শিল্পী বিনয়ের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে বললেন—"আজ্ঞে না, আপনিও অসামান্য।"

একজন শিল্পীর মুখে এ কথা শুনে মনে মনে যদিও প্রীত হলেন অহঙ্কার পাঁড়ে, মুখে তবু বললেন—"মহাবিপদে পড়া গেল দেখছি আপনাকে নিয়ে—"

স্তাবক দু-একজন দাঁড়িয়েছিলেন কাছে, গদগদ হয়ে উঠল তাঁদের চোখের দৃষ্টি। মনে হল তাঁরা যেন নীরবে মিনতি করছেন অহঙ্কার পাঁড়েকে রাজি হয়ে যাবার জন্য।

শিল্পী আবার বললেন—"সত্যিই আপনার ছবি আঁকবার মতো।"

"কি করতে হবে আমাকে?"

"বসে থাকতে হবে শুধু।"

ছবি আঁকা শুরু হল। মধ্যপথেই দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন অহঙ্কার পাঁড়ে।

শিল্পী বললেন—"শেষ হোক আগে, তারপর যা বলবার বলবেন।"

...শেষ হল। ছবির দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে বোমার মতো ফেটে পড়লেন অহঙ্কার পাঁড়ে। নিজের আলেখ্য সম্বন্ধে তারস্বরে যা বললেন তা অলেখ্য। ছবি নিয়ে ছুটে পালাতে হল শিল্পীকে।

ঠিক পরদিনই দেখা গেল শিল্পী আবার আসছে। এবার সাইকেল চড়ে। তাঁর পিছনে একটি কুলি কাগজে মোড়া ফ্রেম-বাঁধানো ছবির মতো কি যেন একটা আনছে মাথায় করে। কাছে আসতে দেখা গেল একটা নয়—দুটো।

অহঙ্কার পাঁড়ে বারান্দাতেই বসেছিলেন।

চোখ পাকিয়ে বললেন—"আবার কি?'

শিল্পী বললেন—"নিজের চোখেই দেখুন।"

বলেই একটা মোড়ক খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। তাঁর প্রথম আঁকা ছবিটি। তারপর হেঁট হয়ে দ্বিতীয় মোড়কটির বাঁধন খুলতে লাগলেন। অহঙ্কার পাঁড়ের মনে হল বোধ হয় ভালো করে আর একখানি ছবি এঁকে এনেছে অনুতপ্তচিত্তে। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সাগ্রহে। দ্বিতীয় বস্তুটি ছবিখানির পাশে রেখেই শিল্পী কিন্তু তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন বারান্দা থেকে। এবং সাইকেল চেপে উধাও হয়ে গেলেন নিমেষে। অহঙ্কার পাঁড়ে বিস্মিত হলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন দ্বিতীয় ছবিটি কাগজ দিয়ে ঢাকা রয়েছে তখনও। উঠে গিয়ে খুললেন সেটা তাড়াতাড়ি। দেখলেন ছবি নয়, একটি বড় আয়না।

দুধের দাম

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশেপাশে জনকয়েক বাঙালি ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞানসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা-যে একজনের হোলড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যালরি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোলড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ি পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়িকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

'পথ দেখে চলতে পার না? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে!'

বুড়ির ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্লাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে। অসম্ভব। ট্রেন বেশিক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইন্টারক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইন্টারক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেন্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালি ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র-সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না, উপদেশ দিলেন।

'উঠলে তো, এখন বসবে কোথায় বাছা?'

'আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন মাত্র, তারপরই নেবে যাব। বেশিক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।'

বুড়ি তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতাজোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আয়তনের মানুষ, গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে! ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালি রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইহারা যে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়তো ইহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কী!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে-স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ির দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

'আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি।'

বুড়ির এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশই ভান করিলেন যেন কিছু শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, 'ভিখারি মাগীর আস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে তো উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—'

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিনিই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিনি নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেন্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল।

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, 'এইসব হেল্পলেস বুড়িকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই নাকি, আশ্চর্য কাণ্ড!'

সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ির কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

'এই বুড়ি, হটো দরোয়াজাসে—'

এক মারোয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলি। তাহার মাথায় স্যুটকেস হোলড-অল। কুলির পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা-পরা লক্কাগোছের এক ছোকরা। সে ভঙ্গিভরে বলিল, 'দয়াময়ী, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!'

'পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।'

'ও দেখি, যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি।'

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল আর ফিরিল না।

যে-বলিষ্ঠ কুলিটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'মাইজি, কিরপা করকে থোড়া হটকে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর কাহে বৈঠ গ্যয়ে?'

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

'আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, প্যয়ে চোট লেগেছে—'

'আপ কাঁহা জায়েগা—?'

'গয়া—'

'চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।'

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলিটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে।

'আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার কা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।'

বৃদ্ধা ওয়েটিংরুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবি পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ,

আর-একজন একখানি ইংরেজি বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবত আলোচনাটা আগেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

'শিভ্যলরি আমাদের দেশেও ছিল। নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, এ-কথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই।'

যিনি নারীমূর্তি-সম্বলিত ইংরেজি মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবত এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

'বলেন কী। এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম নাকি। মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভ্যলরি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ-কথা ভালো করেই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—'

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোনো সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবত এই সাহেবি পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। কোলের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

'আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে?'

'কোনো ভিকিরি-টিকিরি বোধহয়।'

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

'সত্যি, ভিখিরিতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরির সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখফুটে চাইতেও পারে না।'

দেখা গেল ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ির দিকে ছুড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

'পয়সাটা তুলে নাও, পয়সাটা তোমাকেই দিলাম।'

বৃদ্ধা তবু কোনো কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ি বাঙালি নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাস করিয়াছেন।

'পয়সা উঠা লেও। তুমহী কো দিয়া।'

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, 'আমি ভিখিরি নই বাবা, আমি আপনাদের মতো একজন প্যাসেঞ্জার।'

'এখানে কেন? এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিংরুম।

'আমার সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট আছে।'

পরমুহূর্তেই সেই বলিষ্ঠ কুলিটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

'চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।'

তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মতো বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলিটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধামক দিয়া বুড়িকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলির সহিত হিন্দিতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই :

'আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন?'

'তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশি দিলুম।'

'না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না।'

'তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলি ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

বিবর্তন

প্রত্যেক জিনিসই তলাইয়া দেখা উচিত—ইহাই জ্ঞানীগণের পরামর্শ। কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রত্যেক জিনিসই অতলস্পর্শী। কোনো কিছুরই তল খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। সামান্য ধূলিকণারও সম্পূর্ণ রূপ, সম্পূর্ণ ইতিহাস, সম্পূর্ণ রহস্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন সম্পূর্ণ বুদ্ধি আমাদের শিরোভাণ্ডে নাই। যতটুকু আছে ততটুকু লইয়া কেবল দিশাহারা হইয়া পড়া ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যৎসামান্য মস্তিষ্ক না থাকিলেই যেন ভালো হইত। নির্বিকারভাবে খরস্রোতের টানে অনন্তকাল ভাসিয়া যাইতাম, অথবা যেখানে ঠেকিবার ঠেকিয়া থাকিতাম। অনিবার্য খরস্রোতের টানে ভাসিয়াই তো চলিয়াছি; এই দুর্নিবার স্রোতের প্রতিরোধ করি, এমন শক্তি তো নাই। কিন্তু কিছুতেই নির্বিকার থাকিতে পারিতেছি না। অত্যল্প বুদ্ধিপ্রভাবে উচ্চিংড়ার মতো ক্রমাগত তড়পাইতেছি। 'এটা কর', 'ওটা কর', 'এটা করিলে ভালো হইত', 'আহা, এ কথাটা যদি আগে ভাবিতাম' প্রভৃতি নানারূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিক্ষোভ চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। অনতিদূরপ্রসারী জ্ঞানের প্ররোচনায় পড়িয়া জলকে সোজাসুজি জল ভাবিয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তাহাদের মধ্যে মলিকিউল অ্যাটম ইলেকট্রন, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক লীলা এবং তাহারও পশ্চাতে একটা অজ্ঞাত শক্তির আভাস পাইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতেছি। ইহাই হয়তো বিজ্ঞান এবং সর্পের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অথবা ব্রহ্মের মধ্যে সর্পের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা, হয়তো সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কিন্তু এই বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি লইয়া আমরা ডুবিতে বসিয়াছি। সত্য-মিথ্যার এমন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে যে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিবার মতো মানসিক শক্তিও তো নাই। সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিবার অদম্য বাসনা এবং নিজের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে অকথ্য অহঙ্কার—এই দুই প্রস্তরখণ্ড স্কন্ধে বাঁধিয়া আমরা জীবনপ্রবাহে স্বচ্ছন্দে ভাসিতে পারিতেছি না। সহজ গতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিতেও পারিতেছি না, এক্ষেত্রে আমার কী বক্তব্য বা কর্তব্য! নরোত্তম নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তন করিয়াও তো কোনো

কূলকিনারা পাইতেছি না। মনে হইতেছে, নরোত্তম নামক যুবকটির আরও না জানি কত প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। অপ্রত্যাশিতপূর্ব ইহারই নাম কি বিবর্তন?

নরোত্তমকে হিন্দুবংশাবতংস বলিয়াই জানিতাম।

যখন সে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল তখন স্বীকার করিতে বাধা রহিল না যে, ছেলেটি বিদ্যানুরাগীও। তাহার বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে পুলকিত হইলাম। এবং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিলাম। দীর্ঘ জীবন হয়তো সে লাভ করিবে, কিন্তু আমার পুলক বেশিক্ষণ টিকিল না। তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণাটি মনে যখন সানন্দে দৃঢ় করিয়া আনিতেছিলাম, তখন সহসা নরোত্তম এমন একটি কাণ্ড করিয়া বসিল যে, তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণা এবং তজ্জনিত আনন্দ যুগপৎ আমার মন হইতে বিলুপ্ত হইল। দেখিলাম, নরোত্তম দাস খদ্দর ধারণ করিয়া স্কুল-কলেজ-বর্জন-অভিযানে উদ্যত-প্রহরণ হইয়াছে। প্রহরণটি অবশ্য সাংঘাতিক কিছু নয়, নরোত্তমেরই অহিংস রসনা। কিন্তু তাহার অহিংস রসনাটিতেই এমন সহিংস বাণীমূর্তি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল যে, আমরা অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়গমনোন্মুখ বালক-বালিকাদলকে ঘর্মাক্ত-কলেবরে হস্তপদ আস্ফালন করিয়া অহিংসভাবে নরোত্তম ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, বর্তমান অবস্থায় লেখাপড়া শিখিবার প্রয়াস কেবল যে হাস্যকর এবং অনর্থক তাহাই নহে—মহাপাপ। মৃতপ্রায় দেশমাতার কণ্ঠনালীতে যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করিতেছে, চরকা না-ঘুরাইয়া লেখাপড়া শিখিতে গেলে সেটুকুও অবিলম্বে বাহির হইয়া যাইবে।

দলে দলে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কাপড় পুড়াইতে ও চরকা ঘুরাইতে প্রবুদ্ধ হইল। সকলেই দেখিলাম ধৃতখদ্দর গান্ধীটুপি-পরিহিত নরোত্তমের বিশুদ্ধ স্বদেশীয় প্রতিভার নবারুণচ্ছটায় বিদ্যানুরাগী কোমলস্বভাব নরোত্তমচন্দ্র ম্রিয়মাণ হইয়া লজ্জায় আত্মগোপন করিতেছে। আমিও নরোত্তম সম্বন্ধে আমার ধারণাটি পরিবর্তন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু বেশি দিন নয়, আবার নিশ্বাস টানিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে হইল। বহু বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, নরোত্তম গোপনে মদ্যপান করিতেছে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে পুনরায় ধারণা পরিবর্তন করিবার সঙ্গত কারণ ঘটিল। একদিন সন্দেহ হইল, আমার বোতল হইতেও সে কিঞ্চিৎ সুরা অপহরণ করিয়াছে। অনিবার্যভাবে তাহার সম্বন্ধে ধারণা যদিও পরিবর্তিত হইল, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাহার এই সর্বদিক-রক্ষাকারী প্রতিভার অসামান্যতা মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। নিজের বোতলটি সাবধানে রক্ষা করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার গতিবিধি লক্ষ করিতে লাগিলাম। না লক্ষ করিলেই ভালো করিতাম। কারণ লক্ষ করিতে গিয়া বিস্ময় কাটিয়া গেল এবং মুগ্ধ ভাবটাও টিকিল না। একদিন শুনিলাম, গভীর রাত্রে সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়াছে, মুক্তকচ্ছ হইয়া নর্দমায় নাকি পড়িয়াছিল। মনে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু আবার ধারণা পরিবর্তিত করিতে হইল। যাহাকে শ্যাম এবং কূলবজায়কারী নীতিকুশল ভাবিয়াছিলাম, সক্ষোভে স্বীকার করিতেই হইল যে, সে নিতান্ত সাধারণ মদ্যপ।

ইহার পর সহসা সে ডুব মারিল। কোথায় এবং কী কারণে, তাহা জানিতে পারিলাম না। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে শেষ ধারণাটাই মনের মধ্যে বনিয়াদি হইতেছিল। এমন সময়ে

একদিন প্রাতঃকালে নূর ও ফেজক্যাপ-ধারী নরোত্তম আসিয়া আমাকে আদাব করিল এবং বার দুই পিচ ফেলিয়া বলিল যে, সে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমানে তাহার নাম নরোত্তম নয়—নূরুদ্দিন। সম্ভবত আমার নয়নের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে একটু মৃদু হাসিল এবং নূরে বার-দুই হাত বুলাইয়া সবিনয়ে বলিল, যদি অনুমতি করেন, সমস্ত খুলিয়া বলি।

অনুমতি করিলাম।

সে বলিতে লাগিল, দেখুন, অনেক চিন্তা করিয়াই আমি এ কার্য করিয়াছি। আমি নিতান্ত মূর্খ নই এবং জীবনের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাও আমার হইয়াছে। সুতরাং যাহা করিয়াছি, তাহা হঠকারিতা নহে—অনেক চিন্তার ফল। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল ধর্মই মূলত এক। আমিও তাহা স্বীকার করি এবং আশা করি আপনিও করেন। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে এই জ্ঞানগর্ভ সত্যটি স্বীকৃত হইতেছে না। শুধু তাহাই নয়, বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি ধর্মকে প্রশ্রয় দিয়া অন্য এক ধর্মকে নির্যাতিত করাই প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথা আশা করি আপনার অবিদিত নাই যে, আজকাল বাঙালি হিন্দু বলিয়াই বিশেষ করিয়া বিপন্ন, সকলেই মুসলমানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। এ অবস্থা যে মোটেই শান্তিজনক নহে, চাকরি অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। নরোত্তমরূপে আমার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতেছিল, কিন্তু নূরুদ্দিন হইবামাত্রই আমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সকল ধর্মই যদি মূলত এক হয়, ধর্মান্তরগ্রহণের কোনোরূপ নৈতিক বাধা নাই ; অথচ রাজনৈতিক সুবিধা রহিয়াছে। আমার মনে হয়, আর কিছুর জন্য না হউক, রাজনৈতিক চাল হিসাবেই এখন সকলের দলবদ্ধভাবে মুসলমান হইয়া যাওয়া কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা-সমাধানের ইহাই একমাত্র উপায়। আপনি হয়তো বলিবেন, মুসলমানেরাই হিন্দু হউক না কেন। তদুত্তরে আমি বলিব যে, মুসলমানেরা আমাদের অবুঝ ভাই, তাহারা এ যুক্তি কিছুতেই বুঝিবে না। তাহা ছাড়া, যে পরিমাণ মানসিক বিস্তার থাকিলে অনায়াসে ধর্মান্তর গ্রহণ করা যায়, সে পরিমাণ ঔদার্য, যে-কোনো কারণেই হউক, মুসলমানদের সম্প্রতি নাই। মুসলমানদের নাই, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুদের তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা সর্বধর্মের মূলমর্ম বিষয়ে সর্বদাই ওয়াকিবহাল। আমাদের দার্শনিকতার জোরে আমরা সমস্ত কিছুই পরিপাক করিতে সক্ষম। মুসলমানই বা হইতে পারিব না কেন? কিসের বাধা? ইহাতে কতবড় একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান হইয়া যাইবে ভাবিয়া দেখুন দেখি। রসুন পেঁয়াজ মুরগি মুসলমান না হইয়া তো আমরা স্বচ্ছন্দে হজম করিতেছি, লুঙ্গি পরাটাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের মন যেরূপ উদার, তাহাতে কোরান অথবা কলমা পড়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। অথচ তাহাতে সুবিধা কত! আমাদের জাতীয় জঠরের পরিপাকশক্তি এরূপ প্রবল যে, আমার ধারণা আমাদের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। ইতিপূর্বে অর্থাৎ কংগ্রেস যখন হয় নাই, তখন আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নব নব আদর্শ অতি সহজেই হজম করিয়াছিলাম এবং সম্ভবত তাহারই উত্তেজনায় কংগ্রেসের জন্মদান করিয়াছিলাম। পুত্রের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পিতাকে যেমন অনেক সময় প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হইতে হয়, কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার

নিমিত্ত আমাদের সেইরূপ মুসলমানধর্মের আশ্রয় লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, আমরা তাহা পারিবও। কারণ কবি বলিয়াছেন, "শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।" আমরা তুচ্ছ নহি ; প্রয়োজন হইলে আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারি। আমি এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ, আপনার নাতিটি বেকার বসিয়া আছে। সে আমার সহপাঠী ছিল, এবং সে যে তীক্ষ্ণধী এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বাঙালি হিন্দু। তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে। সে যদি মুসলমান হইয়া যায়, অবিলম্বেই তাহার চাকরি জুটিয়া যাইবে ! আপনি এ বিষয়ে কী বলেন ?

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুতভাবে একটা ঢোক গিলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর বলিলাম, আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।

নূরুদ্দিন চলিয়া গেল।

জ্ঞানীগণের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিতেছি ; কিন্তু মনে হইতেছে, সমস্তই অতল।

ব্যবধান

দশ বছরের টুটুল এসে মাকে বললে—"মা বাইরের ঘরে কে একটা দাড়িওলা বুড়ো এসে বসে আছে। বলছে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। আমি বললাম বাবা নেই বাড়িতে, তবু বসে আছে। বলছে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব।"

টুটুলের মা সুমিত্রা রাজি হল না।

বলল—"আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না। বলে দে বাবা ট্যুরে বেরিয়েছেন, আজ ফিরবেন না। মা আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।"

সুমিত্রার মনে হল নিশ্চয় কোন সাহায্যপ্রার্থী। কালই একজন কন্যাদায়গ্রস্ত বুড়ো এসেছিল দুটো টাকা না নিয়ে উঠল না। দেখা করলেই বিপদ।

টুটুল বেরিয়ে এসে বলল—"বাবা ট্যুরে গেছেন, আজ ফিরবেন না। মা দেখা করবেন না আপনার সঙ্গে।" টুটুল জানে বাবা ট্যুরে গেছে এটি মিথ্যা কথা। তবু মায়ের প্ররোচনায় সে মিথ্যা কথাটি বলল গিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, "ও তাই নাকি। আচ্ছা আমি যাচ্ছি তা হলে। তুমি কোন ক্লাসে পড় ?"

"ক্লাস ফোরে।"

"তোমার দাদা ?"

"দাদা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তরুণ দলের সেক্রেটারি হয়েছে আজকাল।"

"তরুণ দলের সেক্রেটারি ? তরুণ দলে কি হয় ?"

"ক্রিকেট খেলা হয়, মাঝে মাঝে গান বাজনার জলসা হয়, থিয়েটার হয় পুজোর সময়। চমৎকার থিয়েটার করে দাদারা। গতবারে আলিবাবাতে দাদা আবদালা সেজেছিল। কি দারুণ জমিয়েছিল যে—"

"তাই নাকি। তোমার দিদি কি করে ?"

"দিদিকে আপনি চেনেন নাকি ?"

"ঠিক চিনি না। তবে তোমার যে দিদি আছে তা জানি। তাই জিগ্যেজ করছি—"

"দিদি আজকাল ভি আই পি।"

"ভি আই পি! তার মানে?"

"দিদি আজকাল এক মিনিস্টারের মেয়েকে গান শেখায়। দিদিকে নিতে প্রকাণ্ড গাড়ি আসে রোজ।"

"তাই নাকি—"

"দিদির জন্যেই বাবার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। আজকাল বাবা যে পোস্টে বদলি হয়েছেন তাতে খুব উপরি—"

"টুটুল শোন—"

ভিতর থেকে সুমিত্রার কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

টুটুল ভিতরে যেতেই ধমক দিয়ে তাকে বললেন—"কি সব বকবক করছিস বাইরের লোকের কাছে। বাক্যবাগীশ কোথাকার। ওপর থেকে তোর দাদাকে ডেকে দে।"

টুটুল দাদাকে ডাকতে তিন তলায় চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি মোটর এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। তার থেকে নামল একটি চটুল তন্বী। মাথার পিছন থেকে লম্বা বেণী দুলছে। পরনে পিঠকাটা ঘাড়কাটা ব্লাউস, কাপড় এমন টাইট করে পরা সর্বাঙ্গ দেখা যাচ্ছে। চোখে কাজল। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে এসে ঢুকল। বৃদ্ধের দিকে এক নজর চেয়ে দেখল কিন্তু তার পরিচয় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। হাতে চাবি-বাঁধা রঙিন রুমালটা ঘোরাতে ঘোরাতে ভিতরের দিকে ঢুকল। তার আবদার-মাখা উচ্চ কণ্ঠস্বর বৃদ্ধ বাইরে থেকে শুনতে পেলেন।

"মা ওমা, কোথা তুমি। আমাকে এখুনি গভর্নরের বাড়ি যেতে হবে পার্টিতে। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে আমাকে। আমি শাড়িটা বদলাতে এলাম। এটা 'ক্রাশড্' হয়ে গেছে—।"

বৃদ্ধ জানলা দিয়ে দেখলেন একটি খালি গ্যারাজ রয়েছে। নিশ্চয় মোটরও আছে এদের। মনে হল—কিন্তু—। চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল তাঁর। ঘরে প্রবেশ করল কালো চোং-প্যান্ট পরা একটি ছোকরা। গায়ে একটি হাফশার্ট রয়েছে। মনে হল জামাটা রোঁয়া-ওলা তোয়ালে থেকে তৈরি। মাথায় লম্বা চুল, গালে চওড়া জুলফি, গোঁফ আর দাড়ির সমন্বয়ে মুখের চারদিকে থুতনি পর্যন্ত চুলের একটা আবেষ্টনী। পায়ে চপ্পল। চোখে গগলস্।

"আপনি কাকে চান?"

"আমি সুরথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"বাবা এখন বাড়িতে নেই।"

"আমি যদি অপেক্ষা করি?"

"না আপনি এখন কেটে পড়ুন।"

"ও আচ্ছা—"

উঠে পড়লেন ভদ্রলোক এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা তিনেক পরে এলেন আবার ভদ্রলোক। দেখলেন কপাট বন্ধ। ইলেকট্রিক বেলের সুইচটা টিপলেন। টুটুল আবার বেরিয়ে এল।

"আপনি আবার এসেছেন?"

"এই চিঠিখানা দিতে এলাম। তোমার বাবা ফিরেছেন?"

"না—"

"এলে এই চিঠিখানা দিও তাঁকে।"

একটি খামে মোড়া চিঠি দিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ঈষৎ মত্ত অবস্থায় রাত্রি দশটা নাগাদ ফিরলেন সুরথবাবু। স্বামীকে মত্ত অবস্থায় দেখে কিছু বললেন না সুমিত্রা। প্রথম প্রথম বলতেন এখন আর বলেন না। মদ খাওয়াটা চা খাওয়ার মতোই এখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ এই সত্যটা মেনে নিয়েছেন তিনি।

সুরথবাবু এসেই প্রশ্ন করলেন—"কোন ফোন এসেছিল?"

"এসেছিল। তোমার স্টেনো মিস মাইতিকে তুমি সন্ধেবেলা আসতে বলেছিলে?"

"বলেছিলাম?"

"আমি মানা করে দিয়েছি। তোমার আপিসের কাজ তুমি আপিসে কোরো। বাড়িতে স্টেনো-ফেনো আনা চলবে না।"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ লক্ষ্য করে হাত উলটে সুরথবাবু বললেন—"বেশ, রাত বারোটা পর্যন্ত আপিসেই থাকব তা হলে। চিঠিপত্র এসেছিল?"

"অনেকগুলো বিল এসেছে। মদের বিল এ মাসে তিনশ টাকা।"

সুরথবাবু মুখটা সুচালো করলেন একটু।

"ও হ্যাঁ। আর এক বুড়ো তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে এসেছিল। দেখা না পেয়ে শেষে টুটুলের কাছে একটা চিঠি রেখে গেছে। কোনও প্রার্থী বোধহয়।"

সুমিত্রা চিঠিখানা দিয়ে উপরে চলে গেলেন।

সুরথবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে খুললেন চিঠিখানা।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমকল্যাণবরেষু

সুরথ, কুড়ি বছর পরে কনখল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম। তোমাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। এসে দেখলাম কেউ আমাকে চিনতে পারছে না। তোমাদের কাছে আমার যে ফোটোটা আছে সেটা আমার যৌবনের। এখন আমি পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। তা ছাড়া গোঁফ দাড়ি রেখেছি আজকাল। চেহারা তো বদলেই গেছে, গলার স্বরও বদলেছে সম্ভবত। আমাকে চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। পেনসন নেবার পরই যখন তোমার চাকরি হল তখনই আমি সংসার ত্যাগ করে কনখলে চলে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি কনখলে আছি। তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই তেমন। কিন্তু আজ একনজর দেখেই বুঝলাম যে ছেলেমেয়েগুলি কেমন যেন অসভ্য হয়ে গেছে। ভদ্রবাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যে ভদ্র নম্রভাব থাকে তা যেন ওদের মুখে নেই। তোমার বাড়িঘর আসবাবপত্র ড্রয়িং রুমের সোফা সেট তোমার মোটরের গ্যারেজ দেখে মনে হল যে মাসে তোমার অন্তত দুই হাজার টাকা খরচ। কিন্তু তোমার মাইনে তো শুনেছি পাঁচশ টাকা। অসদুপায়ে উপার্জন করছ নাকি? আমি সংসারের হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে চাই না বলেই তোমাদের কোনও খবর নিই নি। একা একা কনখলে সুখেই আছি। হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস কচ্ছি। আর প্রতি বছর লটারির টিকিট কিনি। এ বছর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল। দেড় লাখ টাকা পেয়ে গেছি। টেলিগ্রাম পেয়ে

সেইটে নিতেই এসেছিলাম। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অত টাকা নিয়ে আর কি করব? ভেবেছিলাম তোমাদেরই দিয়ে যাব টাকাটা। কিন্তু তোমাদের হাব-ভাব চাল-চলন একটুও ভালো লাগল না। তাই ঠিক করেছি টাকাটা কোনও সৎ প্রতিষ্ঠানেই দান করে যাব আমার মা-বাবার স্মৃতিরক্ষার জন্য। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের সুমতি দিন। আমাদের দেশের আদর্শকে মলিন করবার চেষ্টা করলে তোমরা নিজেরাই মলিন হবে। আদর্শ ঠিক থাকবে। এই কথাটি মনে রেখো। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

আশীর্বাদক

শ্রীদশরথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাবার চিঠির দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন সুরথবাবু। সহসা একটা ছবি ভেসে এল তাঁর মনে—খুব ছেলেবেলায় বাবা তাঁকে কোলে করে পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

মনের এ ভাব কিন্তু পরক্ষণেই কেটে গেল। সহসা তাঁর মনে হল—"এতগুলো টাকা বেহাত হয়ে যাবে? কিছুতেই না। খুঁজে বার করতেই হবে তাঁকে।"

টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

শতাব্দীর ব্যবধান

১৮৭২ সাল।

ডাক্তার নিত্যানন্দ সেন রাত্রি দশটার সময় ক্লান্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়াছেন। কাপড় জামা ছাড়িয়া খাইতে বসিবেন এমন সময় বাহিরের দুয়ারে আর্তকণ্ঠে কে যেন হাঁক দিল—

—'ডাক্তার বাবু'—

বাহির হইয়া দেখিলেন রামপুরের গোপীবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

'আমার ছেলেটি জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, দয়া করে যদি—'

'যাব বইকি, চলুন—'

তখন গরুর গাড়ি চড়িয়া প্র্যাকটিস করিতে হইত। রামপুর গ্রাম এক ক্রোশ দূরে।

গরুর গাড়ি চড়িয়া ডাক্তার সেন যখন রোগীর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন, রোগী তখন মারা গিয়াছে।

ডাক্তার বাবু 'ফি'লইলেন না।

১৯৭২ সাল।

ডাক্তার নিত্যানন্দ সেনের পৌত্র ডা. পি সেন বিদেশী বহু ডিগ্রি অর্জন করিয়া মহাসমারোহে কলিকাতায় প্র্যাকটিস করিতেছেন। তাঁহার চেম্বারে একদিন উক্ত গোপীবাবুর পৌত্র আসিয়া হাজির।

বলিলেন—'আমার স্ত্রী মর-মর। আপনাকে ডাকতে এসেছি। আপনার ঠাকুরদা নিত্যানন্দবাবু আমাদের বাড়ির ডাক্তার ছিলেন—আমাদের বড় আপনজন ছিলেন তিনি—'

ডাক্তার পি সেন ডায়েরি দেখিয়া বলিলেন, "আমি সাতদিনের আগে আপনাকে সময় দিতে পারছি না।"

"আমার স্ত্রী যে মর-মর—"

"সরি, কান্‌ট হেল্‌প। অন্য কাউকে নিয়ে যান।"

শ্রাগ করিলেন।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেনে অসম্ভব ভিড়।

তিল ধারণের স্থান হয়তো আছে কিন্তু মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি পোশাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয় ত নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বারকয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিন রাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতিনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখের-পাতা এক করিতে পারেন নাই।

কাল ত অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে না ঘুমাইবে !

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন—ওরে দাঁড়া !

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ন নহেন, তাহা ঠিক—কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-কোট-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

"টেরেনে ত আজ্ঞে চড়াই দায় হুজুর। যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চড়ে পড়ি—"

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—মূর্খলোক হয়তো, বুঝিতে পারেন নাই—তাই।

বলিলেন—"ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো—"

'ফাসটো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন—"আজ্ঞে ওটাতে নয়, এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে ত গদিমদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়া মানুষ—গরিব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ—বিশ্বাস করুন হুজুর, তিন রাত্রি ঘুম হয় নাই—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচফাটা চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ—চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোম মুখখানি বিনয় গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতিফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন—"এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্য ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি সাহেবি পোশাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

"দ্যাট কান্‌ট বি! আই কান্‌ট এলাউ!" সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন—"আমিও ত হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি! অনুমতি যদি করেন দয়া করে—"

এই বৃদ্ধের সহিত বাগবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পাদানে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ—

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

"শুনলেন হুজুর—এইটাতেই চড়লাম আমি, কুরুকে পাঠিয়ে দেন—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি! ওরে, আন্ আন্ এইটাতেই আন্ সব—ওহে কালীকিঙ্কর—শ্যামাপদ কোথায়—বাঞ্ছা—ও বাঞ্ছা,—এই দিকে—এইখানেই চড়াও সব—"

হৈ হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা, কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটা তরমুজ, একটা বঁটি, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে

নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি ও এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঞ্ছাকে বলিলেন—"তুই তা হলে ওই পাশের কামরাটায় থাক গিয়ে। তোরই মজা হল রে ! তামাক টিকে সব গুছিয়ে রাখ—"

বাঞ্ছা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর !—কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার কেনা-বেচা করতে হবে—"

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রুর দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রুর নির্দেশমতো নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবন্ধ করিলেন।

যদি কেহ গনিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইওর টিকেট্ প্লিজ্।"

"মাই টিকেট্ ইজ ইন্ মাই সুটকেস্। প্লিজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর ইট্।"

"আই কান্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড ! মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেটস্—"

অবশেষে দেখা গেল বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা-সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বেশিক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

ভগবান বিরূপ হইলে কার বাবার সাধ্য ঘুমায় !

দুর্গা—শ্রীহরি !—

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'কুরু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে, যে, বাঙালী বাবুদের সে ভালো করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুল-হীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

"ও কুরু মশায়—বাজে কথার কচ্‌কচিতে আর কাজ কি ! ক'টা টাকা লাগবে বুলন-আমি দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন"—

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি !

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন—

"আপনিও ত হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামতো—"

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রুর দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন—"কটা বাঙালী আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি"—

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কি না জানি না—কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'**র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র